~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী

লেখা না-লেখার গল্প

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

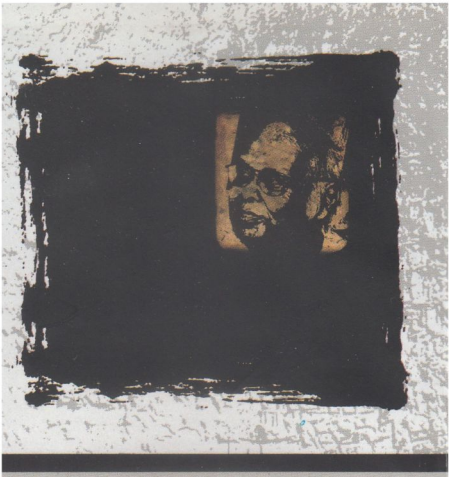

কবি শহীদ কাদরী প্রবাসী। তবু কী আশ্চর্য, বাংলাদেশের হৃদয়ে তাঁর স্থান। অতি বিরলপ্রজ তিনি। সাকুল্যে চারটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে তাঁর। অথচ এর মাঝেই বাংলা কবিতায় তাঁর স্বাক্ষর চির উজ্জ্বল। তাই কবিখ্যাতির শীর্ষে তাঁর অধিস্থান।

অন্যদিকে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গল্পকার, ব্যক্তিগত জীবনে যিনি শহীদ কাদরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাকতালীয় বিষয় হলো, তিনিও দীর্ঘকাল প্রবাসী। দীর্ঘ বিরতিতে আবারও লিখছেন তিনি।

শহীদ কাদরীর মনে, শোনা যায়, একটি কথা কখনো উঠেছিল, আর সেটি হলো বন্ধু জ্যোতিপ্রকাশ তাঁকে নিয়ে কখনো কিছু লেখেন নি। হয়তো এই জন্যেই এবার জ্যোতিপ্রকাশ কলম ধরলেন, বন্ধুর মুখোমুখি হলেন, প্রশ্ন ছুড়লেন নানা বিষয়ে।

শহীদ কাদরীর লেখা না-লেখার কথা, জ্যোতিপ্রকাশেরও, আর দুজনের অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা ঠাঁই পেয়েছে এ গ্রন্থে। এছাড়া পাঠকদের জন্যে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে থাকছে হীরক খণ্ডের মতো জ্বলজ্বলে শহীদ কাদরীর একগুচ্ছ কবিতা। সব মিলিয়ে বলা যায়, এ এক আশ্চর্য যুগলবন্দি!

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

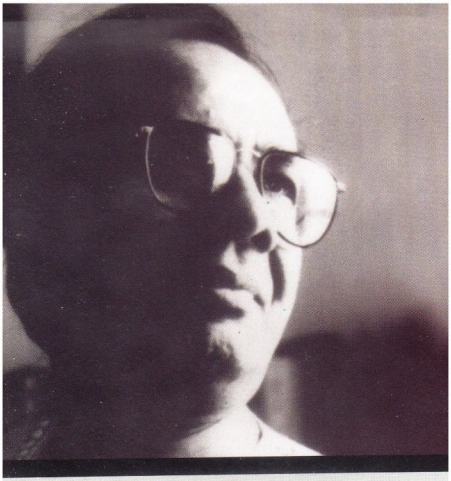

এদেশের সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের কি গদ্যরচনার উৎকর্ষবিষয়ক যে-কোনো বিবেচনার ক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে যাঁদের নাম উঠে আসবে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তাঁদের অন্যতম।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত-র জন্ম কুষ্টিয়ার আমলাবাড়িতে। কুষ্টিয়ায় জন্ম হলেও শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাবনা ও বগুড়ায়। স্কুল-কলেজের পাঠগ্রহণও বগুড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ডিপ্লোমাও অর্জন করেন। তারপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণযোগাযোগে এমএস ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরু হয় বাংলা একাডেমীতে। সেখান থেকে যান বাংলাদেশ অবজারভার-এ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও জনসংযোগ/সম্পাদনার পেশায় কেটেছে দীর্ঘকাল। শেষের আট বছর বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশক জন ওয়াইলি এ্যান্ড সন্স পাবলিশার্স-এ।

মাঝখানে দেশে ফিরে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও 'প্রশিকা'-র তথ্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একইসঙ্গে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগেও খণ্ডকালীন প্রফেসর ছিলেন। সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছেন এখনো। কখনো নিউইয়র্কে কখনো ঢাকায় বাস তাঁর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী

লেখা না-লেখার গল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী
লেখা না-লেখার গল্প

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

অন্যপ্রকাশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ : একুশের বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেট মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য : ২২৫ টাকা (১২ মার্কিন ডলার)

Shahid Kadri Lekha Na Lekhar Galpo
by Jyotiprakash Dutta
Published in Bangladesh
by Mazharul Islam, Anyaprokash
e-mail : anyaprokash38@gmail.com
web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 129 6

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মফিদুল হক
আলমগীর রহমান
মাজহারুল ইসলাম
আমাদের আপনজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা দীর্ঘকালীন নয়। নিউইয়র্কে তাঁর ভ্রমণকালে *অন্যদিন* সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম প্রস্তাব করেন *অন্যদিন*-এ প্রকাশের জন্যে আমরা কেননা শহীদ কাদরীর সঙ্গে আমাদের আলাপ শব্দযন্ত্রে ধারণ করি–প্রায় সাক্ষাৎকারের ধরনেই! মনে পড়ে, শহীদ আমাদের এক বন্ধুর কাছে নাকি বলেছিলেন, 'জ্যোতি আমার সম্বন্ধে কখনো কিছু লিখল না'। আমি তাই মাজহারের কথায় সম্মতি জানাই।

দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হলে মাজহার আমাকে বলেন, সাক্ষাৎকারটির সঙ্গে শহীদ কাদরীর কিছু কবিতা ও আমাদের লেখা না-লেখা সম্পর্কে একটি রচনা যোগ করলে ওইসব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়। শহীদকে সে-কথা জানালে তিনি রাজি হন। তবে বলেন, 'এর সঙ্গে তোমার দুটি গল্পও কেন যোগ করে দাও না।' আমি বলি, 'শহীদ, তাহলে বইটির কাঠামোই পাল্টে দিতে হয়। এত দ্রুত সেটি সম্ভব কি ?' শহীদ বোঝেন। এই গ্রন্থের পেছনের কথা এটুকুই।

শহীদের কবিতাসমূহ আমারই বেছে দেওয়া। তার অর্থ এই নয় যে তার অন্যসব কবিতা আমার পছন্দ নয়। নেহায়েৎ সীমিত সংখ্যক পৃষ্ঠার জন্যেই এই বাছাবাছি।

মাজহারুল ইসলামের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, এতকাল পরে বন্ধুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের এই সুযোগ তিনি করে দিলেন। তাই কৃতিত্ব যা সব তাঁরই প্রাপ্য।

শহীদ কাদরীও বন্ধুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে অকৃপণ নন–একথাও এখানে লেখা থাক। এত অসুস্থতার মধ্যেও দীর্ঘসময় কথাবার্তায় ব্যয় করা সেটিই প্রমাণ করে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
ডেনভার, কলোরাডো
ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচি

লেখা না-লেখার গল্প ১১
কবির মুখোমুখি ২৯
শহীদ কাদরীর বাছাই কবিতা
বৃষ্টি, বৃষ্টি ৫৯
নপুংসক সন্তের উক্তি ৬২
নশ্বর জ্যোৎস্নায় ৬৪
প্রেমিকের গান ৬৫
উত্তরাধিকার ৬৬
পাশের কামরার প্রেমিক ৬৮
কবিতাই আরাধ্য জানি ৬৯
নিরুদ্দেশ যাত্রা ৭০
পরস্পরের দিকে ৭২
বিপরীত বিহার ৭৩
ইন্দ্রজাল ৭৪
আলোকিত গণিকাবৃন্দ ৭৫
চন্দ্রালোকে ৭৬
এই শীতে ৭৭
চন্দ্রাহত সাক্ষাৎ ৭৮
অগ্রজের উত্তর ৭৯
রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌ ৮০
শেষ বংশধর ৮১
অন্য কিছু না ৮২
রবীন্দ্রনাথ ৮৩
কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার ৮৫
তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা ৮৭
আজ সারাদিন ৮৯
কেন যেতে চাই ৯১
একটা মরা শালিক ৯৩
একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল ৯৫
স্বতন্ত্র শতকের দিকে ৯৮
আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও ১০০
একে বলতে পারো একুশের কবিতা ১০১
তাই এই দীর্ঘ পরবাস ১০৩
সব নদী ঘরে ফেরে ১০৫
প্রবাসের পঙ্‌ক্তিমালা ১০৬
যাত্রা ১০৮
কাক ১০৯
নিরুদ্দেশ যাত্রা ১১০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখা না-লেখার গল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক

শহীদ কাদরী, বন্ধুবরেষু–কত সহজেই না লিখতে পারি। যদি লিখতে হতো বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ শহীদ কাদরী, কী লিখতে হতো কিংবদন্তির কবি শহীদ কাদরী, তাহলে তার কথা তার কবিতার কথা লেখা আমার জন্যে সহজ হতো না। কাব্যরসিক সমালোচক যেমন নির্মোহ দৃষ্টিতে কাব্যস্রষ্টা ও তার সৃষ্টির আলোচনা করতে পারেন, বন্ধু তেমন পারে না। এ কারণেই।

শহীদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঢাকার অভয় দাস লেন-এর *সমকাল* অফিসে অথবা ওয়ারীর লারমিনি স্ট্রীটে সেবাব্রত চৌধুরীর বৈঠকখানায়। তার পরনের ট্রাউজার ও ব্লেজারের রঙ এখন আর আমার চোখে ভাসে না কিন্তু দীপ্ত তার ওই চেহারা কখনো ভুলি না। মাত্র কিছুকাল আগে মফস্বল কলেজ থেকে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি আমি, স্বল্পভাষী আধুনিক চেহারার শহুরে তরুণ আমায় কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্প্রভ করে দিতেই পারে। দিয়েছিলও হয়তো যদিও তখন আমি জানতাম না শহীদ কলকাতাকেও পেছনে ফেলে এসেছে। সে কবিতা লেখে সেবাব্রতর মুখে এ কথা শুনলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর পত্রিকায় শহীদের কবিতা প্রকাশ করেছেন জানা ছিল না, যেমন অনুমান করি শহীদও বগুড়া আজিজুল হক কলেজ বার্ষিকীতে অথবা *আজাদ, মিল্লাত ইত্যাকার* সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার গল্পাবলির কোনো খোঁজ রাখতো না। ওই সময়ে 'সমকাল' অত্যন্ত নামি সাহিত্য পত্রিকা এবং *সমকাল* প্রকাশের বছরখানেক পরেই দ্বিমাসিক 'উত্তরণ' প্রকাশিত হলে সেটিও সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনে সাদরে গৃহীত হয়। 'উত্তরণ'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার পরিচয় সর্বজনজ্ঞাত ছিল বলে আমার বিশ্বাস থাকলেও শহীদ সে কথা জানতো বলে আমি মনে করি না। স্পষ্টতই ওই সময়ে আমাদের মধ্যে কোনো নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। অনিয়মিত দেখা সাক্ষাতের কথাই কেবল মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, উনি শ' বাষট্টিতে *সপ্তক* প্রকাশের সময় থেকেই তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা। মধ্যকার সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমাদের রচনাদি প্রকাশিত হলেও এসব বিষয়ে কখনো কোনো কথাবার্তা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে *সপ্তক*-এ তার আসা-যাওয়া।

ষাট দশকের পূর্ববাংলায় প্রথম লিটল ম্যাগাজিন *সপ্তক*। সম্পাদকবিহীন ওই অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন সাতসুরের স্বরগ্রামের মতোই সাত নবীন কবি যশোপ্রার্থীর সম্মিলনের স্বাক্ষর; তৎকালীন সাহিত্য সমাজে নিজেদের স্থানটিকে দৃশ্যমান করে তোলার প্রবল আগ্রহের ফসল। *সপ্তক* প্রকাশের সময় থেকেই শহীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আমার বিশ্বাস, এবং আমার মতো আরো অনেকেরই বিশ্বাস, আমার গল্পকার পরিচয় এবং শহীদ কাদরীর কবি পরিচয় স্পষ্ট রূপ নেয় ওই *সপ্তক*-এর কাল থেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সপ্তক ষাট দশকের প্রথম ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিন। ছোট কাগজের সমস্ত চরিত্র সপ্তকের মধ্যে ছিল। সাত তরুণ মিলে এটি প্রকাশ করেছিলেন বলে নাম দেওয়া হয় *সপ্তক*। সেবাব্রত চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হুমায়ুন চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, শফিক খান, শহীদ কাদরী এবং দেবব্রত চৌধুরী কি আল মাহমুদ। সপ্তম সদস্যপদটি খোলা ছিল। দেবব্রত চৌধুরী কবি, সেবাব্রত তার অনুজ, আর আল মাহমুদ এসেছিলেন সেবাব্রত ও শহীদের সঙ্গে। *সপ্তক*-এর কোনো সম্পাদক ছিল না। সম্পাদকের দায়িত্ব পাছে কাউকে বেশি সম্মানে ঠেলে দেয় এই চিন্তাও সম্ভবত ছিল। এ কারণে সহপাঠী শফিক খান, সেই মুহূর্তে লেখালেখিতে খুব সক্রিয় না-হলেও শাহজাহান প্রিন্টিং প্রেসের মালিক হওয়ার সুবাদে প্রকাশকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত বাক্যবন্ধ মদীয় 'ষাট দশকের ছোট কাগজ, ছোট নয়' রচনাটির অংশ। শহীদ কাদরীর রচনা প্রসঙ্গে এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন এইজন্য যে শহীদ তার সৃষ্টির মানসিকতায় ষাট দশকের অত্যাধুনিক, বিদ্রোহী লেখকগোষ্ঠীর অনেক কাছাকাছি ছিল। সেকালে প্রতিষ্ঠিত কী পরিচিত লেখককুলের মানসিকতার সঙ্গে তার নৈকট্য ছিল না। *সপ্তক*-এর অন্যতম কবি হায়াৎ মামুদ, পরে পাঠকনন্দিত প্রাবন্ধিক-গবেষক-গদ্যশিল্পী, এখনো মনে রেখেছেন যে শহীদ কাদরী প্রায়ই ফুলতলি স্টেশনের কাছে *সপ্তক*-এর কার্যালয় শাহজাহান প্রিন্টিং প্রেস-এর অফিসে আসতেন।

সপ্তক-এর প্রসিদ্ধিই ছিল এস্টাব্লিশমেন্টপন্থী, গতানুগতিক প্রকাশিত সাহিত্য চিন্তার বিপরীতে অবস্থান নেয়ার জন্যে। তৎকালীন সাহিত্য সমাজ কী পাঠকসমাজ আমাদের গোষ্ঠীকে যে চোখেই দেখুন না কেন আমরা নিজেদের সর্বাধুনিক বলে মনে করতাম। শহীদ আমাদের মানসিকতারই অংশভাক ছিল।

সপ্তক প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই প্রকাশিত হয় *স্বাক্ষর*। *সপ্তক*-এর বাইরে থাকা আমাদের মতোই বিদ্রোহী লেখক কতিপয়ের কেউ কেউ একত্রিত হয়ে প্রকাশ করেন *স্বাক্ষর*। শোনা যায়, *সপ্তক*কেও নাকি *স্বাক্ষর* গোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক বলে বিবেচনা করতেন। *স্বাক্ষর*-এর ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়ায় 'সাম্প্রতিক'। তার কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হতে থাকে *কণ্ঠস্বর*–নিয়মিতই। যদিও *কণ্ঠস্বর* লিটল ম্যাগাজিনের সমগোত্রীয় ছিল না, বরং এস্টাব্লিশমেন্টপন্থীই ছিল বলা যায়–*কণ্ঠস্বর* সম্পাদক অবশ্য কোনোকালেই এ-কথা মানবেন না। শহীদ *কণ্ঠস্বর*-এও শামিল হয়েছিল। অবশ্য সে অনেক পরের কথা। শহীদ ততদিনে ঢাকা টেলিভিশনে কর্মরত। আমি বাংলা একাডেমী ও *পাকিস্তান অবজারভার*-এ কয়েক বছর কাটিয়ে সাতসমুদ্র পার হয়ে চলে এসেছি। *সপ্তক*-এর সদস্যের জন্যে সেটিই হয়তো ভবিতব্য ছিল। এখন লক্ষ করি *সপ্তক*-এর সাত সদস্যের মধ্যে পাঁচজনই দীর্ঘকাল বিদেশবাসী ছিলেন। আমি, শহীদ ও দেবব্রত চৌধুরী আজও বিদেশেই। হায়াৎ মামুদ ও হুমায়ূন চৌধুরীও কাটিয়েছেন বিদেশে দীর্ঘকাল। গতানুগতিকতা এড়ানোর জন্যেই সম্ভবত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* ১৯৫৯-এ প্রকাশিত হয়। ওই কবিতাগ্রন্থের সমুদয় রচনা একাধিকবার পড়েছিলাম তার প্রুফপাঠক হিসেবে। এ-কারণে সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আধুনিক বাংলা কবিতা তথা পূর্ববাংলার আধুনিক কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় একরকম ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে বলা যায়। পরিচিতি ঘটে তৎকালীন সর্বাধুনিক গদ্য রচনাবলির সঙ্গেও–*নতুন সাহিত্য, চতুরঙ্গ, পরিচয়, নন্দন* ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা, *সমকাল* ও *উত্তরণ*-এর মাধ্যমে। বিশেষত দেশি ও বিদেশি আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে ওই সময়ের নতুন আধুনিক কবিতার মতোই নতুন আধুনিক গল্প লেখার চেষ্টা করে চলি। উনষাট-এর কোনো এক সময়ে আমার গল্প 'পরমাত্মীয়', *উত্তরণ*-এ প্রকাশিত হলে সতীর্থরা মনে করেন কবিতা ও গল্প উভয়ক্ষেত্রেই সর্বাধুনিক বাংলা রচনার পথে উঠেছি আমরা এবং সেই চিন্তা-আশ্রয়ী কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি *সপ্তক* ও তার কিছু পরে প্রকাশিত লিটন ম্যাগাজিন *কালবেলা*। তেষট্টির কোনো এক সময়ই সম্ভবত *সমকাল*-এ আমার গল্প 'একজন পুরুষ চাই' প্রকাশিত হলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে–এদেশে নতুন সাহিত্যের স্রোতটিকে বইয়ে দিতে পেরেছি। বাষট্টির কোনো এক সময়ে *সপ্তক* প্রকাশিত হয় এবং আমার গল্প *আরও কয়েকটি পুতুল*-এর সঙ্গে শহীদ-এর কবিতাও প্রকাশিত হয়। শহীদের কবিতা আমাদের প্রায় বিমোহিত করে। ফলে, *সপ্তক*-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় উনিশো তেষট্টির আগস্টে শহীদ কাদরীর একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়। আমাদের ধারণা অনুযায়ী শহীদ কাদরীর একাধিক কবিতা একসঙ্গে তার আগে কখনো প্রকাশিত হয় নি।

শহীদ কাদরীর রচনা প্রসঙ্গে *সপ্তক, কালবেলা* কী আমার নানা রচনার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, আমরা মনে করি, *সপ্তক*-এর মধ্য দিয়েই শহীদ কাদরী ও আমিসহ কয়েকজন নতুন সাহিত্যকর্মী পাঠকসমাজের সামনে উজ্জ্বল উপস্থিতি স্পষ্ট করতে পেরেছিলাম।

সপ্তক-এর আগে শহীদ কাদরীর রচনা অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তার কবিতার প্রতি পাঠকের আগ্রহ *সপ্তক*ই সৃষ্টি করে বলে এখনো যাঁরা *সপ্তক*কে মনে রেখেছেন তাঁদের ধারণা।

সপ্তক-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় শহীদ কাদরীর যে ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে তিনটি কবিতার কথা আমার মনে পড়ে–'টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব', 'পাশের কামরার প্রেমিক', ও 'চন্দ্রালোকে'।

তিরিশ-চল্লিশের কবিতায় তখনও আচ্ছন্ন আমরা। পঞ্চাশের বামপন্থী কবিকুল কিঞ্চিৎ হৃদয় স্পর্শ করেছেন হয়তো, ষাটের রাগী অমিতবিক্রম কবিকুল তখনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অত প্রতাপী নন, ওই সময় শামসুর রাহমানের কবিতা কেবল নতুন কবিতার স্বাদই নয়, যেন নতুন কবিতার জগতই খুলে দেয়, অন্তত আমার সামনে। আর ঠিক তখনই শহীদ কাদরীর কবিতা পড়ি :

কালো ডায়ালে আমার আঙুলে ঐন্দ্রজালিক
ঘুরছে নম্বরগুলি–
শহরের ওপর থেকে
দূরদূর বাস গাড়ির ঘণ্টাধ্বনি তরঙ্গিত ঘাসে-ভরা
স্টেডিয়ামের ওপর থেকে
আসছে :
'না, না, না'–কী জ্যোৎস্না কণ্ঠস্বর।
কত কাঁপন চিকন কালো তারে।
আমি ঠিক জানি চড়ুইপাখির মতো ঠোঁটজোড়া কাঁপছে
'না, না, না'

প্রাত্যহিকতার চিত্রকল্প, সময়ের অবিকল প্রক্ষেপন, পরিচিত মানবী আবেগের আশ্রয়ে শহীদের কবিতা অন্যসব কবিতার চাইতে যেন আলাদা মনে হয়। আরো পড়ি–

আর ঐ ডাকসাইটে লাল ঘোড়া
যদি ধরে ফেলে এই কামরায় গোধূলিকে ছত্রখান করে
'না, না, না'
আমি জানি চড়ুইপাখির মতো ঠোঁটজোড়া কাঁপছে।
(টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব)

স্পষ্ট বুঝি, এই আমাদের নতুন কবিতা। আবার পড়ি *সপ্তকে* প্রকাশিত তাঁর অন্য কবিতাটি :

গলা চিরে থুথু ফ্যালে দাপায় কপাট নড়বড়ে
শ্বাসকষ্ট যা পায় তা প্রেম; ঠান্ডা হাওয়া
হৎপিণ্ডে বিরক্তিকর উৎকট নর্তন
অলৌকিক ইচ্ছা তার তাকে দিয়ে টেবিল বাজায়
(পাশের কামরার প্রেমিক)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তরুণ কবির অবিশ্বাস্য পরিণত নতুন কবিতা। আমরা মানি–

এ হেন অনেক কিছু, একটু আয়াসে চীনেবাদামের খোসা
ভাঙতে-ভাঙতে পার হওয়া যায় হে দীপ্ত প্রেমিক, বন্ধু ভাই
যথা শান্ত দুপুরে দেলাক্রোয়ার ক্রুদ্ধ, রুদ্ধ, মত্ত অশ্বারোহী
ট্রেনের কাটা শূকরের লালরক্ত, মৃত্যু, আর্তনাদ।
(পাশের কামরার প্রেমিক)

পরিচিত, যন্ত্রণাক্ত, অসহ্য জীবনে অপরিচিত জগতের অমিত উত্তেজনা, ক্রোধ অত সহজে তুলে আনেন যে কবি তাঁর কবিতায় তিনি আলোর বৃত্তে দাঁড়াবেনই, এ-ও আমরা ভেবেছিলাম।

অন্য কবিতার এই পঙ্‌ক্তি ক'টিও কখনো ভুলি না :

'হে আমার প্রেম, নিষ্প্রাণ ময়ূরপঙ্খী কোন জলে ভাসবে না ?'
(বালির তরঙ্গে তার নিতম্বের কঠিন করোটি, কোনো কান্নাই
ছোঁবে না)
হে আমার প্রেম, নিষ্প্রাণ ময়ূরপঙ্খী দাঁড় পড়ে হৃৎস্পন্দনে
আমার অপেক্ষা ফুরোবে না।
(চন্দ্রালোকে)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

*কালবেলা*র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত বৎসরাধিক সময়কালে। প্রতি সংখ্যায়ই শহীদ কাদরীর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত *কালবেলা* প্রকৃতই নতুন সাহিত্যের উৎসাহী পাঠককুলে সাড়া ফেলেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। *চতুরঙ্গ* ও *দেশ*সহ নানা পত্র-পত্রিকায় 'কালবেলা'র অনুকূল আলোচনা প্রকাশিত হয় এবং *সপ্তক* থেকে *কালবেলা*–এই চার-পাঁচ বছর সময়কালেই ওই পত্রিকা দু'টিতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত লেখকই বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে যান।

ওই সময়ে এখলাসউদ্দিন আহমদ *টাপুর টুপুর* নামে কিশোরদের জন্যে একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। চট্টগ্রামের পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'বইঘর' পত্রিকাটির প্রকাশক। *টাপুর টুপুর*-এর লেখালেখির আঙিনায় আমরাও উঠে আসি এবং *বইঘর*-এর স্বত্বাধিকারী শফি আহমদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। *টাপুর টুপুর*-এর রচনাদি ছাড়াও তার প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ অতি মনোগ্রাহী ছিল। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সৃষ্টি সে-সব দেখলেই চিনতাম আমরা। আর অমনি করেই কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গেও আমাদের হৃদ্যতা জন্মে। কিশোর পত্রিকা হলেও *টাপুর টুপুর*-এ প্রতিষ্ঠিত কী নবীন সকলেই লিখতেন। কিছুকালের মধ্যেই 'বইঘর' কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পকর্মের আশ্রয়ে পুস্তক প্রকাশনা শুরু করে। একসঙ্গে প্রকাশিত বইঘর-এর প্রথম তিনটি কবিতাগ্রন্থ শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা', আল মাহমুদের 'কালের কলস' ও শহীদ কাদরীর 'উত্তরাধিকার' কেবল যে তৎকালীন প্রকাশনা শিল্পের অভূতপূর্ব সৌকর্যের পরিচয় বহন করে তা-ই নয়, আমাদের সাহিত্যেও নতুন যুগ, নতুন পর্বের সূচনা করে। স্পষ্টতই শহীদ কাদরী তখন খ্যাতিমান কবির সারিতে উঠে এসেছেন। এবং এখন আমরা পেছন ফিরে দেখি ওই তিন কবিই পরে আমাদের কবিতার তিন প্রধান পুরুষ রূপে পাঠকচিত্তে স্থান করে নেন।

উত্তরাধিকার-এর প্রকাশকাল ১৯৬৭। সেটি শহীদ কাদরীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। কিয়ৎ পরিমাণে কাকতালীয় হলেও লক্ষ করি আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দুর্বিনীত কাল', তারও প্রকাশ তখনই–১৯৬৭।

শহীদের পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*র প্রকাশকাল ১৯৭৪; তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই*–প্রকাশকাল ১৯৭৮; এবং সর্বশেষ এবং চতুর্থ কবিতাসংগ্রহ *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* : অতি সাম্প্রতিক প্রকাশনা–২০১১। সাতবছর, চার বছর ও তেত্রিশ বছর–শহীদ কাদরীর কবিতাগ্রন্থসমূহের প্রকাশকালীন ব্যবধান এমনই। সময়ের এই মাপ কিছু বিস্ময়ের সৃষ্টি করতেই পারে। তবে এটি অভূতপূর্ব কিছু নয়। আমার নিজের প্রথম তিনটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গল্পসংগ্রহ এক বছর পরপর প্রকাশিত হয়। চতুর্থ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কুড়ি বছর পরে। সময়ের এই উল্লম্ফন আমাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছে ঘর ছাড়ার কারণেই। আমার দেশত্যাগ ঘটে তৃতীয় গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই, শহীদেরও অমন–তৃতীয় কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরই। এই তথ্য থেকে যদি এমন মনে হয় যে দেশত্যাগ ছেড়ে আসা দেশের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে সহায়ক নয়, হয়তো সেটি যথার্থই। এমনও যদি বলা যায়, নিজ ভূমি ত্যাগ যে-কোনো শিল্পীর শিল্প সৃষ্টিতেই বাধা সৃষ্টি করে–সেটিও হয়তো খুব অযথার্থ হবে না। যদিও আমরা জানি, কিছু শিল্পী দেশত্যাগ করেও মহৎ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। শহীদ কাদরীর ক্ষেত্রে উভয় ধারণাই সঠিক বলে মনে করা যায়। দেশত্যাগ-এর পরে তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থের ঔৎকর্ষের বিচার কালের হাতেই তোলা থাক।

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরে শহীদ দেশত্যাগ করেন। প্রথমে স্বল্প সময়ের জন্যে, পরে পাকাপাকি। সত্তরের শেষ দিকে সে বিদেশে যায় বলে জানি, কিন্তু কিছুকাল পরেই ফিরে আসে। আমি দেশত্যাগ করি উনসত্তরের শেষার্ধে। তারপরে শহীদের সঙ্গে আমার দেখা প্রায় দশ বছরের বেশি কাল পরে–১৯৮০-তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেবিনে। সায়াটিকা জাতীয় কোমরের ব্যথায় চিকিৎসাধীন। ওই সামান্য সময়ের সাক্ষাতে তার কাব্যকৃতির কোনো আলোচনা করা হয় নি। করার কথাও ছিল না। *উত্তরাধিকার* প্রকাশের পরেই তার কবিখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। নানা পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে এবং তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* প্রকাশের আগের বছরেই কবিতায় বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় তাকে। তার মাত্র দু'বছর আগে ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় আমাকেও। বাষট্টির সপ্তক যে কবি ও গল্পকারদ্বয়কে পাঠকের সম্মুখে দাঁড় করায়–মাত্র দশ বছরের ব্যবধানেই তাদের রচনা সাহিত্যসমাজের স্বীকৃতি লাভ করে।

ওই হাসপাতালের পরে শহীদের সঙ্গে আমার দেখা হয় লন্ডনে ১৯৮৩-তে। লন্ডনবাসী কবি দেবব্রত চৌধুরী আমাকে শহীদের কাছে নিয়ে যান 'সুরমা' পত্রিকার অফিসে। 'সুরমা'য় কর্মরত শহীদ তখন। লন্ডনে আমার বড়ভাইয়ের বাড়িতে আসে শহীদ। তখনই তার মুখে শুনি তার যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার কথা। মাত্র কয়েক মাস পরেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার

যাপিত জীবনের কিছু ছায়া লেখকের রচনায় পড়ে–এ কথা জানা। লেখকের আপন জীবনই তার রচনার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান। এ-কথাও অনেকে বলেন। সময়, সমাজ, স্বদেশ, দূরদেশ, পরিপার্শ্ব, পরিবেশ এইসব নিয়েও কথা হয়–লেখকের রচনায় কী পরিমাণ প্রভাব ফেলে ওইসব। কিন্তু সময়, সমাজ, স্বদেশ, দূরদেশ, পরিপার্শ্ব পরিবেশ ইত্যাকার বিষয় যে লেখককে রচনাবিমুখও করে তার কথা বেশি শোনা যায় না।

দেশ-বিদেশের অনেক লেখকের কথাই আমরা জানি যাঁরা ক্ষীণপ্রজ অথচ রচনার ঔৎকর্ষে সর্বদাই লোকমুখে থাকেন। আবার দেখা যায়, অনেক লেখক প্রথম জীবনে প্রচুর গুণান্বিত রচনার পরে আর বেশি লেখেন না, বা লেখেনই না, এবং পরবর্তীতে রচনাসমূহ তেমন সমৃদ্ধও হয় না। শহীদ কাদরীর রচনা ও তার জীবন অনুমান করি–ওই উভয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝার চেষ্টা করা যায়।

শহীদের কাব্যকর্ম তার কৈশোরকালেই শুরু বলা যায়। *স্পন্দন*-এ তার কবিতা প্রকাশিত হয় উনিশশো পঞ্চান্ন'র দিকে, *কবিতায়* প্রকাশিত হয় উনিশশো ছাপ্পান্নয়। শহীদ কলকাতা থেকে ঢাকায় আসে বাহান্ন'র শুরুতে, তখন তার বয়স বারো-তেরো। *স্পন্দন* কি *কবিতায়* রচনা প্রকাশের কালে তার বয়স পনেরো-ষোলো ছিল বলা যায়। পরবর্তী কয়েক বছর নিশ্চয়ই সে কবিতা লিখেছে, প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিপুল নয়। তাই *সপ্তক* প্রকাশকালে সহজেই আমরা তাকে আমাদের সদ্য তরুণ বিদ্রোহী আধুনিক নবীন লেখককুলে মেশাতে পারি। আমার নিজের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় বগুড়া আজিজুল হক কলেজ বার্ষিকীতে–১৯৫৬ সালে। শহীদের সমকালেই প্রায়।

সপ্তক ও *কালবেলা* পর্বের পরে শহীদের রচনার পরিমাণে ভাঁটা পড়ে। স্পষ্টই সেটি বোঝা যায় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার'-এর কবিতা সংখ্যা চল্লিশটি। প্রকাশকাল ১৯৬৭। এগারো-বারো বছরে চল্লিশটি কবিতা। যদি ধরে নেওয়া যায় *উত্তরাধিকার*-এর বাইরেও তার কিছু কবিতা ছিল ওই কালে, তবুও বছরে গড়ে চারটির বেশি কবিতার হিসাব পাওয়া যায় না। সাত বছর পরে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমায়* কবিতার সংখ্যা একত্রিশটি। গড় হিসাব ওই একই থাকে–বছরে চারটি। অথচ বছরে গড়ে চারটি করে কবিতা লেখার কবিই ১৯৭৩-এ কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। শহীদ কাদরীর কবিতার বৈভব ওই সামান্য পরিমাণ ও সময়েই কাব্যরসিক পাঠককুলকে মোহিত করেছিল।

তার তৃতীয় গ্রন্থ 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই' ধারণ করে আছে পঁয়ত্রিশটি কবিতা। দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে চার বছর পরে প্রকাশিত। এবারে যেন তার কবিতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রচনায় উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে বছরে প্রায় আটটি করে কবিতা। চতুর্থ গ্রন্থ *আমার চুম্বনগুলি পৌঁছে দাও* ছত্রিশটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বত্রিশ বছর পরে। বোঝাই যায়, দীর্ঘকাল কবিতা রচনায় বিরত ছিল সে। ক্বচিৎ কখনো একটি দু'টি কবিতা লিখেছে হয়তো।

স্বভাবতই তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কবিতার অতি ধীর গতির, কী কখনো থামার কখনো চলার ধরনটিকে অনেকেই বুঝতে চাইবেন। আমি নিজেও বোঝার চেষ্টা করছি। সম্ভবত এ-কারণে আরও বেশি যে, আমারও প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থ পরপর প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-৬৯ সময়কালে। চতুর্থ গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কুড়ি বছর পরে ১৯৮৯-এ। আমার লেখার কালে আঠারো বছরের একটি বিরতি ছিল। পরে ১৯৮৭ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি, অতি ধীরগতিতে হলেও, লেখার স্রোতটি বহমান আছে–একেবারে শুকোয় নি এখনো। শহীদের লেখক-জীবনের সঙ্গে আমার লেখক জীবনের বহিরঙ্গের এই মিল–চাই কী কিয়ৎ পরিমাণে যাপিত জীবনের সঙ্গেও, সম্ভবত কাকতালীয়ই, তবুও লক্ষযোগ্য। যদিও শহীদের যাপিত জীবনের তাবৎ কাহিনি আমার জানা নেই, বিশেষত ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সময়টিকে আমাদের সম্পর্কের অন্ধকারের যুগই বলা যায়–পৃথিবীর দুইপ্রান্তে দুইজনের বসবাসের কারণেই। যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন ছিল। লন্ডনে ১৯৮৩-তে দেখা হওয়ার পরেই সম্পর্কটি পুনঃস্থাপিত হয়। তাই শহীদের যাপিত জীবন ও লেখক-জীবনকে বোঝার আমার চেষ্টাটি যথেষ্ট পরিশীলিত নয় ভাবলে ভুল হবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

'না, শহীদ সে তো নেই, গোধূলিতে তাকে
কখনো বাসায় কেউ কোনোদিন পায় নি, পাবে না।
নিসর্গে তেমন মন নেই, তাহলে ভালোই হতো
অন্তত চোখের রোগ সযত্নে সারিয়ে তুলতো হরিৎ পত্রালি।
কিন্তু মধ্য-রাত্রির সশব্দ কড়া তার রুক্ষ হাতের নড়ায়
(যেন দুঃসংবাদ নিতান্ত জরুরি) আমাকে অর্ধেক স্বপ্ন থেকে
দুঃস্বপ্নে জাগিয়ে দিয়ে, তারপর যেন মর্মাহতের মতন
এমন চিৎকার করে 'ভাই, ভাই, ভাই' বলে ডাকে...
মনে পড়ে সেবার দার্জিলিঙের সে কী পিচ্ছিল রাস্তার কথা–
একটি অচেনা লোক ওরকম ডেকে-ডেকে-ডেকে খসে পড়ে
গিয়েছিল হাজার-হাজার ফিট নিচে।
সভয়ে দরোজা খুলি–এইভাবে দেখা পাই তার–মাঝরাতে
জানি না কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে দিনরাত কাটে
চাকুরিতে মন নেই, সর্বদাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা
মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে।
না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকালবেলায় সে তো শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।

(অগ্রজের উত্তর)

কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার সুযোগ নিলাম এই কারণে যে, এটি আমার প্রিয় কবিতা। এই শহীদ কাদরীকে আমি চিনি। যেন আমার চোখের সামনেই দেখি–এই এতকাল পরেও। শহীদের রচনায় শাহেদ কাদরীর বিরক্ত, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী ওই বয়ান অনেকবারই শুনেছি–কখনো দরোজার কড়া নাড়বার আগেই। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো তিনি আমাদের দেখলেই জানিয়ে দিতেন, শহীদ বাড়ি নেই। তবে সব দিন নয়–অনেক সময়ই তাকে পেতাম বাড়িতে। বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে হয়তো রাত্রির ঘুম ভেঙে ওঠা শহীদ হাতমুখ ধুয়ে কী দিনের ঢেকে রাখা খাবার কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে আসত সারা বিকাল কী সন্ধ্যা কী রাত্রির মতোই। আমি অফিস ফেরতা, যতক্ষণ পারা যায় একসঙ্গে থাকতাম। গোপীবাগ পার হয়ে মতিঝিল কি হাটখোলা কী ওয়ারী, তারপর গুলিস্তান, স্টেডিয়াম এবং শেষে 'রেক্স' কি 'গুলসিতান' রেস্তোরাঁয়। আমার বাইরে থাকার সময় শেষ হলে ঘরে ফেরার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্যে রিকশা ডাকি, পরদিন অফিস আছে, আর শহীদ ধীরে চলে যায় ফুলতলা স্টেশনের রেলওয়ে রেস্তোরাঁর দিকে। ভিন্ন এক সুহৃদের দল সেখানে অপেক্ষায় আছে তার জন্যে–নীরু, বুড়ো, বাচ্চু। আমাদের সঙ্গে প্রায় কখনোই তাদের দেখা হতো না। ফলে শহীদের নিশিযাপনের বিবরণ প্রায় কিছুই জানি না কখনো।

একবার আমরা কয়েকজন–হায়াৎ মামুদ, আল মাহমুদ, হুমায়ূন চৌধুরীসহ 'রেক্স' রেস্তোরাঁর প্রায় পেছনেই 'মর্নিং নিউজ' অফিসে গিয়ে শামসুর রাহমানকে সঙ্গে নিই। তারপর সেকালের সন্ধ্যাপরের স্টেডিয়াম, নির্জন মতিঝিল, হাটখোলা, টয়েনবি সার্কুলার রোড ধরে ফুলতলা স্টেশনের কাছে আসবার আগেই শামসুর রাহমান আর হাঁটতে চান না। তাঁকে রিকশায় তুলে দিয়ে চলি আমরা ঢাকা স্টেশনের দিকে।

এই রকম করেই চলেছিল কিছুকাল। পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বর আমাদের এ সান্ধ্যসম্মিলন বন্ধ করে দেয়। ব্ল্যাকআউটের রাত্রি, নানা শঙ্কা, দুর্ভাবনায় সাহিত্য সৃষ্টির চিন্তাও থাকে না আর মনে। তৎকালীন সরকারের কিছু হয়রানির শিকারও হই আমি–এবং ওই বছরেরই শেষে ঢাকা টেলিভিশনের উদ্বোধন হয়। সতীর্থ গল্পকার হুমায়ুন চৌধুরী ঢাকা টেলিভিশনে যোগ দেয়। আমি বাংলা একাডেমীর চাকরি ছেড়ে দিলে কবি আবদুল গনি হাজারি আমাকে *অবজারভার*-এ ডেকে নিয়ে যান, *সানডে অবজারভার*-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তার কিছুকাল পরেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি শহীদ ঢাকা টেলিভিশনে নিয়মিত চাকরি নিয়েছে–প্রোগ্রাম প্রডিউসারের।

শহীদ ঢাকা টেলিভিশনে আসবার ফলে টেলিভিশনের দরজা খুলে যায় আমাদের জন্যে। বিশেষ বিশেষ সাহিত্য আসরেই কেবল নয়, শহীদ ছিল বলেই ঢাকা টেলিভিশনের জন্যে নাটক লিখতেও শুরু করি। শহীদই প্রস্তাব দেয়, 'ডায়ালগ লেখায় তোমার ভালো হাত, নাটক লেখো।' শহীদ আমার একাধিক নাটক প্রযোজনা করেছিল। একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি সে হারিয়েও ফেলে–কোনোদিন আর সেটি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আমি যখন দেশ ছাড়ি শহীদ তখন ঢাকা টেলিভিশনে কর্মরত। *উত্তরাধিকার* প্রকাশিত হয়েছে, নতুন আধুনিক বাংলা কবিতার ভুবনে তার পরিচিতি কাউকে বলে দিতে হয় না। ঊনসত্তরের পরে কখন, কোথায়, কী কবিতা সে লিখেছে ভালো জানি না। *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমার* একত্রিশটি কবিতাকেই ধরে নিতে হয় তার রচনার পরিমাণ–সাত বছরের ফসল কিন্তু ওই ফসলই মুগ্ধ করেছিল বাংলা কবিতার পাঠককে–১৯৭৩-এর বাংলা একাডেমীর পুরস্কার তার প্রমাণ। পরবর্তী চার বছরে তার কবিতা রচনায় একরকম গতির সঞ্চার হয়েছিল বোঝা যায়–*কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই* গ্রন্থের পঁয়ত্রিশটি কবিতা থেকে। কবিতা রচনায় তার উৎসাহ স্পষ্ট–অনেকে তার কারণও হয়তো খুঁজবেন। সে তখন বিবাহিত। এক রকম অনুকূল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাতাস হয়তো বয়েছিল তার জীবনে তখন। তার কাছের লোকেরা সে কথা ভালো জানেন, আমি জানি না। শুধু উনিশশো আশিতে যখন তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যাশায়ী দেখি তখন ঢাকায় সে একা। স্ত্রী বিদেশে। শুনি সে-ও বিদেশে কিছুকাল কাটিয়ে ফিরে এসেছে আবার বিদেশে যাবে বলেই। কী পরিমাণ কবিতা জমা হয়েছিল আটাত্তর-এর পরে তার সংগ্রহে অথবা লেখাই বা হয়েছিল কী পরিমাণ, জানি না। শুধু দেখি ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ছত্রিশ। এবং লক্ষ করি ওই ছত্রিশটি কবিতার মধ্যে বেশ কিছু কবিতা পুরনো শতকের শেষে, নতুন শতকের প্রথমে লেখা। আমার পরিচিত কয়েকটি কবিতা দেখি–আমারই তাগিদে লেখা।

শহীদ কাদরী রচিত কবিতার সংখ্যা ও রচনাকালের ব্যাপ্তিবিষয়ক এই বিবরণ নিতান্ত মামুলি–চাই কী প্রচুর পরিমাণ কাব্যজ্ঞানসমৃদ্ধ কী বুদ্ধিদীপ্তও নয়। তবুও এই বিবরণ এটিই সম্ভবত বোঝায় যে আশির পরে দীর্ঘকাল শহীদ কবিতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ওই সময়ে তার জীবনে নানা প্রতিকূলতা কী অনিকেত যাত্রাপথের কথা অনেকেই বলবেন জানি, কিন্তু পরে যখন তার জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে স্বস্তি ফিরেছিল তখনো সে কবিতাবিমুখই ছিল। অথবা তা-ই কি ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছয়

উনিশশো তিরাশির মে মাসে সপ্তাহ দু'য়েকের জন্যে আমি ও পূরবী ইউরোপে বেড়াতে যাই–নিউইয়র্ক থেকে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড। যাওয়া-আসার পথে লন্ডনে দু'চার দিন করে থাকা। পূরবীকে শহীদ দেখেছিল ঢাকাতেই। সাতষট্টিতে আমার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল সে।

লন্ডনে পৌঁছে কবি দেবব্রত চৌধুরীর মুখে শহীদ কাদরীর লন্ডনবাসের কথা শুনি এবং দেবুদাকে নিয়ে শহীদের সঙ্গে দেখা করতে *সুরমা* পত্রিকার অফিসে যাই। শহীদ সেখানে সপ্তাহের কিছু সময় ব্যয় করত পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্যকারী হিসেবে। ওইদিন দেখা হওয়ার পরে স্থির হয় আমরা ইউরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরলে শহীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানো যাবে।

সাতদিন পরে শহীদ আমার বড়ভাইয়ের বেলহ্যামের বাসস্থানে দেখা করতে আসে। পুরনো দিনের নানা গল্পের শেষে রাত্রি এলে সে আমাদের সঙ্গেই থেকে যায়। কথায় কথায় শহীদকে বলি, আমার কিছু নগদ অর্থ প্রয়োজন তাই পরদিন ব্যাংকে যেতে হবে ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানোর জন্যে। ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই জানিয়ে শহীদ আমাকে প্রয়োজনমতো ডলার দিয়ে বলে, আমি খুব শিগগিরই আমেরিকায় আসছি। ওখানেই বরং টাকাটা ফেরত দিয়ো। অতি বিস্মিত আমি বেশি প্রশ্ন করবার সুযোগ পাই না। শহীদও বেশি কিছু বলে না।

দু'তিন মাস পরে শহীদের টেলিফোন পাই। বস্টনের উপকণ্ঠে মলডেন শহরে থাকে সে। নতুন সংসার। যেন যাই তাকে দেখতে। শহীদের প্রথম সংসার ভেঙে যাওয়ার খবর জানতাম আগেই, ফলে লন্ডন থেকে বস্টন আসার কথা বুঝে যাই সহজেই। বস্টনের শহরতলী মলডেন সম্পন্ন মধ্যবিত্তের অঞ্চল। শহীদের বাস বহুতল এক অ্যাপার্টমেন্টে। তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী ডেনার সঙ্গেও আলাপ হয়। শুনি ডেনার সঙ্গেই লন্ডন ছেড়ে এসেছে সে। ডেনা দেখি অতি স্বাস্থ্য সচেতন । বারবার তরকারি ধুয়ে নেয়, বাঁধাকপির কয়েকস্তরের পাতা ফেলে দিয়ে রান্না করে। ভাবি মধ্যরাত্রে 'ভাই, ভাই, ভাই' বলে দরজায় কড়া নাড়া শহীদের জন্যে এ বড়ো মন্দ ব্যবস্থা নয়।

মলডেনে একাধিকবার গেছি আমরা। আমাদের ছয় বছরের কন্যা জয়ীষাসহ কখনো কবি ইকবাল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে, কখনো সাংবাদিক বদিউজ্জামান খসরুকে নিয়ে, কখনো উভয়ের সঙ্গে। ইকবাল সত্তরের দশকে ঢাকায় শহীদের বৃত্তভুক্ত ছিল; খসরু লন্ডনে বাসকালে বেশ কিছুকাল শহীদের সঙ্গে দিনরাত্রি কাটিয়েছে। খসরুর মুখেই লন্ডনের টোয়েনবি হলে শহীদের ঘরে সাত ঘরছাড়া বাঙালির রাত কাটানোর গল্প শুনেছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মলডেনের আড্ডায় লেখালেখির নানা কথা উঠত। উনসত্তরে দেশ ছাড়ার আগে আমার তৃতীয় গল্পগ্রন্থটি বেরোয় তারপর থেকে আমারও বাংলায় লেখা বন্ধ। স্বভাবতই লেখা না-লেখার নানা আলাপে রাত্রি ভোর হতো। আমি আবার লেখা শুরুর কথা বলতাম। শহীদকে কবিতা লেখার কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিতো, 'দূরো কবিতা লিখে কী হবে!' বাংলা কী ইংরেজি কবিতার বই সাজানো তার শেলফে, বস্টনের কিছু মার্কিনী কবিযশোপ্রার্থীর সঙ্গে আলাপও হয়েছিল তার। তাদের কবিতা পাঠের আসরে গেছেও শহীদ কখনো কখনো তবুও কবিতা লেখার কথায় কান দিত না। যদিও দেখেছিলাম একটি শপিং ব্যাগে নানা টুকরো কাগজে এমনকি পেপার টাওয়েলেও কবিতার দু'চার পঙ্‌ক্তি মনে এলে লিখে রাখছে সে। সেইসব ছাপানোর কথা উঠলে তার ওই এক কথা, কবিতা লিখে কী হবে! ডেনা বলত, কবিতা লেখাটাই আসল কথা। লিখলেই যে ছাপাতে হবে তার মানে আছে কি ?

আমাদের পুত্রসন্তান দীপন জন্মানোর কিছুকাল পরে শহীদ ডেনাকে নিয়ে নিউইয়র্কে আমাদের পার্কওয়ে ভিলেজের বাসায় বেড়াতে আসে। পঁচাশির শেষ দিকে সম্ভবত। আর ঠিক ওই সময়েই নিউইয়র্ক থেকে সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ *প্রবাসী* নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। ইকবাল হাসান *প্রবাসী*র প্রথম সংখ্যার জন্যে একটি সাহিত্য পাতার আয়োজন করে। আমাকে লিখতে বলে, শহীদকেও। যথারীতি ভয় দেখিয়ে বলে, যদি গল্প লিখে না দিই তাহলে সে আমার পুরনো গল্পই একটি ছেপে দেবে। দিয়েছিলও তা-ই। শহীদের একটি কবিতাও ছেপেছিল। বাধ্য হয়ে *প্রবাসী*র পরবর্তী সংখ্যার জন্যে আট বছর আগে শুরু করা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প 'দিন ফুরনোর খেলা' শেষ করে *প্রবাসী*তে ছাপাতে দিই। আঠারো বছর পরে সে-ই আবার আমার গল্পলেখা শুরু। ইকবাল হাসানের প্ররোচনায়, আগ্রহে। শহীদের কবিতাও *প্রবাসী*তে ছাপা হয়েছে কোনো কোনো বিশেষ সংখ্যায়। সেসব তার পূর্বে লেখা না নতুন লেখা কবিতা জানি না তা। পুরোপুরি তাকে কবিতা লেখায় ফেরানো না-গেলেও কবিতা-লেখার প্রতি তার বিরোধিতা অনেকাংশে কমেছিল সেই কালে বলে আমাদের ধারণা। এমনকি উনিশশো বিরানব্বইয়ে 'যুক্তরাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ' নামে আমরা নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-পেনসিলভেনিয়া-কানেকটিকাট-ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যসমূহে বসবাসরত বাংলা সাহিত্যসেবকদের যে গোষ্ঠীর পত্তন করেছিলাম তার প্রথম সাহিত্য সমাবেশে শহীদ কাদরীকে প্রায় জোর করেই নিয়ে এসেছিলাম প্রধান অতিথি হিসেবে। ঢাকা থেকে নির্মলেন্দু গুণও এসেছিলেন সেই সাহিত্য সমাবেশে। রকেফেলার ইউনিভার্সিটির স্কলারস রেসিডেন্সের আঠাশ তলায় অনুষ্ঠিত সেই সাহিত্য সম্মেলনে নির্মলেন্দু গুণের একটি কথা মনে পড়ে, 'আজ আপনারা বাংলা সাহিত্যকে যে অভূতপূর্ব উচ্চতায় তুলে এনেছেন...।' প্রকৃতই মাটি থেকে এত উঁচুতে বাংলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের কোনো সমাবেশ হয়েছে বলে জানি না। সাহিত্য সমাবেশের শেষে শহীদ কাদরী ও গুণকে নিয়ে চলে যাই জাতিসংঘের সামনে 'মুক্তধারা ও বাঙালির চেতনা মঞ্চ' নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিতে–প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে, ইস্ট রিভার থেকে উঠে আসা হাড় হিম করা বাতাসকে আমল না দিয়ে।

'যুক্তরাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ' প্রায় পাঁচ বছর টিকেছিল। সাহিত্য পরিষদের নানা সভায় ও অনুষ্ঠানে ঢাকা ও কলকাতার অনেক যশস্বী লেখক অংশগ্রহণ করেছেন। শহীদ কাদরীকে আর আনা যায় নি। তবুও মনে হয় সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ শহীদের মনে আবার কবিতা লেখার সামান্য বাসনা সঞ্চারিত করতে পেরেছিল।

সাতাশির শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে মনস্থির করলে শহীদকে সেকথা জানাই। নভেম্বরের দিকে দেশে ফিরে যাওয়া যখন প্রায় নিশ্চিত শহীদকে টেলিফোন করলে ডেনা টেলিফোন ধরে বলে, তোমরা বরং আর শহীদকে ফোন করো না। দেশে ফিরে যাওয়ার কথা শুনলেই সে অস্থির হয়ে পড়বে, মন খারাপ করবে। ওই দেশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। হি বিলংস হেয়ার।

দেশে সেইবার আমি বছরখানেক ছিলাম। ফিরে এলে দেখি শহীদ মলডেন ছেড়ে সালেম-এ চলে গেছে। পারিবারিক আবেষ্টনও পাল্টেছে বেশ। সালেম-এ এক হাসপাতালে কাজ করে সে তখন। সালেম-এও গেছি আমি শহীদ কাদরীর বাসায়। কবিতার আলাপে কবিতা লেখানোর চেষ্টা। উননব্বইয়ে দেশ থেকে ফিরে আমি প্রকাশনা সংস্থা জন ওয়াইলি অ্যান্ড সন্স-এ কাজ শুরু করি। দেশে পাকাপাকি ফেরার চিন্তা কিছুতে ছাড়ে না। শহীদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়। তবু তার মধ্যে বিরানব্বইয়ে দেশে 'সাহিত্যপ্রকাশ'-এর মফিদুল হক-এর সঙ্গে আলাপে শহীদের কথা ওঠে। মফিদুল বলেন, শহীদ কাদরীর কোনো বই তো আর পাওয়া যায় না। যদি আমি শহীদকে রাজি করাতে পারি তাহলে তিনটি বই একত্র করে একখণ্ডে প্রকাশ করা যায়। আমি সাগ্রহে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করি। শহীদের সঙ্গে কথা বলি–১৯৯৩-এ শহীদ কাদরীর তিনটি কবিতাগ্রন্থ একত্রে 'শহীদ কাদরীর কবিতা' নামে 'সাহিত্যপ্রকাশ' একালের পাঠকের হাতে তুলে দেয়। শহীদ কাদরীর বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়ার কুড়ি বছর পর। শহীদের নতুন করে পাঠকের কাছে পৌঁছনোর ওই ঘটনাস্রোতে আমার সম্পৃক্ততার কথা ভাবলে সামান্য আত্মপ্রসাদ বোধ করি না এমন নয়, যদিও কবিতার জগতে শহীদের পুরোপুরি না-ফেরার কথা মনে থেকে যায়। ক্বচিৎ ক্বচিৎ দু'একটি কবিতা *প্রবাসী*তে ছাপা হয়েছে তখন।

সাতানব্বইয়ে জন ওয়াইলির চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই। এইবার দীর্ঘ সময়ের জন্য। যদিও বছরে একাধিকবার এ দেশে যাতায়াত আমার থাকেই। শহীদের সঙ্গে যোগাযোগও থাকে–ক্ষীণ হলেও। দুই হাজার-এর প্রথম কয়েক বছরে আবার যাওয়া-আসার কোনো এক কালেই শহীদের সঙ্গে দেখা হয়। বুঝি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনের মোড় পাল্টেছে তার আবার। সংসারের। অসুস্থতাটিও ধরা পড়েছে ততদিনে। নিউইয়র্কেই বাস তখন তার। মনে হয় নতুন সংসারে সে বেশ স্বচ্ছন্দে, সযত্নে আছে। একাকী জীবন আর নয়। আমাদের রকল্যান্ড কাউন্টির বাড়িতে আসে সে সস্ত্রীক। কবিতার কথা হয়। দু'একটি কবিতা লেখেও। *কালি ও কলম*-এ ছাপা হয়। এবং ওই সময়ই কখনো ঘরে, কখনো হাসপাতালে কখনোবা সপ্তাহে তিনদিন কাটে ডায়ালাইসিসের যন্ত্রণায়, ঘোরে, আমি তাকে চতুর্থ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সাজাতে বলি। নীরার উৎসাহে সেটি সাজানোও হয়ে যায়। প্রকাশক বন্ধু আলমগীর রহমানকে বলি সেটি প্রকাশের জন্যে। আলমগীর সানন্দে রাজি হয়ে যান। নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক *বাঙালি*র সম্পাদক কৌশিক আহমদ মুদ্রাক্ষরিক-এর কাজ করেন। দুই হাজার নয়-এর ফেব্রুয়ারিতে *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* শহীদের কবিতাপিপাসু পাঠক হাতে পায়–এতকাল পরে। পুনরায় দেখেন তারা তাঁকে। বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পুরস্কারে' সম্মানিত করেন তাকে। শহীদের পুনরাবির্ভাব চিরউজ্জ্বল হয়ে যায়। এবং এই জন্যেই বুঝি, কবিতায় শহীদের আগ্রহ আবার সকলে জেনে যায়। হৃদয়ের গভীরে যেটি ছিল, এখন সেটি যেন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

শহীদ-এর নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়মিত কবিতার আসর হয়। কাব্যপাঠ, আলোচনা। কাব্যরসিক শ্রোতাকুল পরম আনন্দে সে-সবে অংশগ্রহণ করেন। নীরা কাদরী সব আসরের আয়োজক, পরিচালক। কবিতা সম্পর্কে অনেক কথাও বলে শহীদ এখন–কাগজে কাগজে।

যাপিত জীবনের কিছু ছায়া লেখকের রচনায় পড়ে, এ-কথা জানা। লেখকের আপন জীবনই তাঁর রচনার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান এ-কথাও অনেকে বলেন। সময়, সমাজ, স্বদেশ, দূরদেশ, পরিপার্শ্ব এইসব নিয়েও কথা হয়–লেখকের রচনার কী পরিমাণ প্রভাব ফেলে ওইসব। কিন্তু সময়, সমাজ, স্বদেশ, দূরদেশ, পরিপার্শ্ব, পরিবেশ ইত্যাকার বিষয় লেখককে রচনাবিমুখও করে। তবে কখনো কোনো জীবনানুকূল বাতাস শরীর স্পর্শ করলে লেখক আবারও উড়তে পারেন সেই হাওয়ায়, ছড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর সৃষ্টি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবির মুখোমুখি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি শহীদ কাদরী

প্রবাসে, তবু বাংলাদেশেব হৃদয়ে

বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি শহীদ কাদরী। দেশ ছেড়েছেন প্রায় ৩৫ বছর আগে। এই সময়ের মধ্যে মাত্র একবারই তিনি দেশে এসেছিলেন। সেও প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল। অতি বিরলপ্রজ তিনি। দেশে থাকতে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। আর মাত্র কিছুদিন আগে আরেকটি। অথচ এই সৃষ্টিসম্ভারই তাঁকে কবিখ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। দীর্ঘ বিদেশবাস তাঁর নামকে নিঃসন্দেহে বাংলাভাষার বিস্মৃত কবির তালিকায় তুলে দিতে পারত, কিন্তু আশ্চর্য তা ঘটে নি। পাঠকহৃদয়ে তিনি আজও অমলিন। তাঁর কবিতা এখনো পাঠকপ্রিয়।

এটি মূলত শহীদ কাদরীর সাক্ষাৎকার। আলাপচারিতার ভঙ্গিতে নেওয়া সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। সঙ্গে ছিলেন *অন্যদিন*-এর সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম। নিউইয়র্কে, শহীদ কাদরীর অ্যাপার্টমেন্টে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও শহীদ কাদরীর মধ্যে নানারকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের এই দুই স্রষ্টা ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পঞ্চাশ বছরেরও ওপরে তাঁদের বন্ধুত্ব। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত দেশ ছেড়েছেন ৪২ বছর আগে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদিও দেশে যাওয়া-আসা আছে নিয়মিত। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে এক হিসেবে বিরলপ্রজই বলা যায়। বিদেশবাস কালে মাঝখানে ১৮ বছর তিনি কিছুই লেখেন নি। যদিও বিগত কুড়ি বছর ধরে তিনি নিয়মিতই লিখছেন বলা যায়। তিনিও প্রধানত বাস করেন নিউইয়র্কে।

আমরা, *অন্যদিন*-এর পক্ষ থেকে, এই দুই বন্ধুকে কাছাকাছি এনে তাদের কিছু কথাবার্তা শব্দধারণ যন্ত্রে তুলে নিয়েছিলাম। যদিও শহীদ কাদরীই মূল বক্তা, উদ্দেশ্যই ছিল তাই, তবুও আমরা ভেবেছি এই দু'জনের মধ্যে কথাবার্তায় যে হার্দ্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা চিরাচরিত সাক্ষাৎকারের কাঠামোটি পাল্টে দিবে। পাঠকের জন্য নিঃসন্দেহে সেটি উপভোগ্য হবে বলেই আমাদের ধারণা।

মাজহারুল ইসলাম এখানে আমরা সকলেই ঘটনাটি জানি। কিন্তু আমাদের পাঠকদের জন্য যদি ঘটনাটি বলতেন।

শহীদ কাদরী : না, আমি এখন আর কোনোভাবেই এ ঘটনা বলতে চাই না। আল মাহমুদ আমার ওপরে খেপে আছেন, এখনো খেপে আছেন, তিনি ভোলেন নি কোনোদিনও। উপরন্তু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আবার এ গল্পটা তার 'ভালবাসার সাম্পান' বইতে লিখেছেন। আমি তাকে বলেছিলাম, তুই এটা লিখতে গেলি কেন ? এটা তো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ব্যাপার, নিজেদের ব্যাপার, তোর লেখা উচিত হয় নি রে। তবে যাই হোক আল মাহমুদ এখন বয়োবৃদ্ধ...একটি বিশেষ দলের বড় কবি হিসেবে পরিচিত। সেদিক দিয়ে আমার মনে হয় না তার কোনো দুঃখ আছে। তবে আমি তার কবিতা পুড়িয়েছিলাম। ২য় মহাযুদ্ধের পর অনেক কবি-সাহিত্যিকই নাৎসীদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, অনেকে ফ্যাসিবাদকে নানান কারণে ভুল বুঝেছিলেন, কিন্তু পরে এরা ভালো লিখেছেন... এরা কবি মানুষ, ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক দিকগুলো না বুঝেই ফ্যাসিবাদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। পরে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কবিতাগুলো বর্তমানের সব সংকলনেই থাকে। ফ্যাসিবাদটাকে আড়াল করে আমরা তাদের ভালো কবিতাগুলো পড়ি। আল মাহমুদের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আমার কোনোরকম সমর্থনই নেই, কিন্তু তার প্রথম দিকের কবিতাগুলো... 'সোনালি কাবিন' পর্যন্ত...নিতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তুমি চমৎকার একটি প্রসঙ্গ তুলেছ। এ প্রশ্নটি সবাই করে। প্রশ্নটি হলো, কবির রাজনৈতিক বিশ্বাস যদি কবিতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, সেটা কি তখনো কবিতা থাকে ?

শহীদ কাদরী এটার উত্তর একইসঙ্গে হ্যাঁ এবং না। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে যদি কাব্যে উত্তীর্ণ করা যায়, তাহলে সেটা কবিতা থাকবে কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসকে যদি স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হয় কবিতায় তাহলে সেটা আর কবিতা থাকবে না। কিন্তু উচ্চকণ্ঠ হলে যে কবিতা হবে না আমি সেটা বিশ্বাস করি না। নেরুদা যথেষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন এবং সেগুলো যথেষ্ট ভালো কবিতা। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসটা মানবিক হতে হবে। রাজনৈতিক বিশ্বাসটা যদি সাম্প্রদায়িক হয় এবং যারা এই রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত নন তাদের হত্যা করো, নির্বংশ করো–ফ্যাসিবাদ যেটা করতে চেয়েছিল, তা যদি হয়, সেটা কোনো অবস্থাতেই কবিতা নয়। ফ্যাসিবাদী ছবির কথা শুনেছি কিন্তু ফ্যাসিবাদী কবিতার সংস্পর্শে আমি এখনো আসি নি। কিন্তু আমার মনে হয় রোমান্টিক কবিদের মধ্যেই কিছুটা ফ্যাসিবাদী জার্ম আছে। কারণ ফ্যাসিবাদ যেটা বলে, ফ্যাসিবাদের যে একটা পিকটোরিয়াল প্রেজেন্টেশন হয়, অনেকগুলো কাঠি একসঙ্গে বাঁধা আর সঙ্গে একটা কুড়োল। একটা কুড়োল এক ঘায়ে সবগুলো কাঠি ভেঙে ফেলতে পারে। ভার্চুয়াসরা রাজত্ব করবে ননভার্চুয়াস জনগণের ওপর–এই রোমান্টিক হিরোইজমের মধ্যে কিন্তু ফ্যাসিবাদের জার্ম রয়েই গেছে। ফ্যাসিবাদ যে ইউরোপের কিছু ইন্টেলেকচুয়ালের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল তার কারণ কিন্তু এটাই।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাংলা কবিতায় রাজনৈতিক বিশ্বাসে উজ্জীবিত অনেক কবি আছেন, সার্থক অনেক কবিই আছেন–এ সম্পর্কে কিছু বলো।

শহীদ কাদরী : বুদ্ধদেব যখন আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন করেন তিনি প্রথমেই বাদ দিলেন যারা তথাকথিত মার্কসিস্ট কবি। এর আগে বুদ্ধদেব সুকান্তের কবিতার একটা আলোচনা লিখেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায়, তাতে তিনি আগাগোড়াই বলেছেন তাঁর কবিতাগুলো উচ্চকণ্ঠ, একদর্শী এবং এগুলো কবিতা হয় নি। বলে তিনি অন্য একটা কবিতা কোট করে বলেছিলেন, মনে হয় এখানে কবিতা আছে–'দেয়ালে দেয়ালে/ মনের খেয়ালে/ লিখি কথা/ হয়েছি বেকার/ পেয়েছি লেখার/ স্বাধীনতা।' তিনি বলেছিলেন, এই পঙ্‌ক্তিগুলো যে লিখেছে তার পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু কবি হওয়ার আগেই সুকান্ত প্রয়াত। কিন্তু বুদ্ধদেব যখন আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন করলেন তখন দেখা গেল সেখানে সুকান্তের ছ'সাতটি কবিতা। তাঁর উপরে তখন জনমতের চাপ ছিল এবং তাঁকে যারা সংকলনের কাজে সহায়তা করছিলেন, যেমন নরেশ গুহ, অরুণ কুমার সরকার, তাঁরা বুঝিয়েছিলেন, সুকান্তের যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা আছে, তাঁর লেখা না নিলে সংকলনের গুরুত্ব কমে যাবে। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর প্রবন্ধে বুদ্ধদেব শুধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলাকৌশলের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু 'কমরেড, ফুল খেলিবার দিন নয় অদ্য'–এ বক্তব্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব কোনো মন্তব্যই করেন নি। সবসময়ই বুদ্ধদেব এরকম। বুদ্ধদেব যে সারা পৃথিবীর কবিদের নিয়ে লিখলেন, কোনদিনই বুদ্ধদেব নেরুদার নামই উচ্চারণ করেন নি। আবার সমর সেনকে বুদ্ধদেব নিয়েছেন, সমর সেনের কবিতাতে মার্কসবাদ বা শ্রেণী সংগ্রামের কথা একেবারেই অনুচ্চারিত, শুধু একটা মধ্যবিত্ত মানুষের হতাশার কথা সেখানে এসেছে। একটা রোমান্টিক অন্তঃস্রোত আছে তাঁর লেখায়। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই সংকলনে মার্কসবাদী

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য বড় বড় কবিরা বাদ পড়েছেন, জগন্নাথ চক্রবর্তী বাদ পড়েছেন, রাম বসু বাদ পড়েছেন, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বাদ পড়েছেন, গোলাম কুদ্দুস বাদ পড়েছেন, মনীন্দ্র রায়ের শুধু একটি কবিতা নেওয়া হয়েছে। এতে বিষ্ণু দে যথেষ্ট পরিমাণে আহত হয়ে 'একালের কবিতা' নামে আরেকটি সংকলন করেন, যেখানে মার্কসবাদী কবিদের প্রতি তিনি সুবিচার করেছেন বলে তাঁর ধারণা।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস আছে তোমার কবিতায় ?

শহীদ কাদরী : একেবারে প্রাথমিক পর্যায় বাদ দিয়ে কবিতা লেখার শুরুর দিকেই জীবনানন্দের একটা প্রবন্ধ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হই। সেখানে তিনি বলেছিলেন, কবিতার শরীরের ভেতরে থাকবে কবির চিন্তা-ভাবনা এবং মেধার স্বাক্ষর, নারীর কটাক্ষের পেছনে শিরা-উপশিরার মতো। আমার ধারণা আমার প্রথম বই 'উত্তরাধিকার'-এর ভেতরের কথাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজে বহিরাগতের মতো জীবনযাপন। সেখানে একজন হতাশাগ্রস্ত লোক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, যার কোনো রুট নেই। আমার একটি কবিতার নাম হলো 'আমি কিছুই কিনব না'। সেই লোক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নানান পণ্য দেখছে এবং বলছে, আমি কিছুই কিনব না। সেখানে আমি পণ্য উৎপাদনকারী বর্তমান যে আধা পুঁজিবাদী আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে, তা সরাসরি রিজেক্ট করেছি। কিন্তু কোনোখানেই বলা হচ্ছে না আমি মার্কসবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু আগাগোড়াই আমি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরেও আমি মনে করি, মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় নি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এই যে তুমি বলো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় একজন হতাশ, একজন উদ্বাস্তু মানুষ–এই মানুষের চিন্তা কি এলিটিস্ট নয় ?

শহীদ কাদরী আসলে এক অর্থে সমস্ত মার্কসিস্ট সাহিত্যই এলিটিস্ট। মার্কসবাদ পড়বে কে ? মার্কসবাদ পড়বে যারা তারা তো এলিটিস্ট সোসাইটিরই লোকজন। আমরা যে সাহিত্যটা করি, সেখানে লেখক হবেন ডিক্লাসড। যে এলিটিস্ট শ্রেণীতে তিনি জন্মেছেন, সে শ্রেণী থেকে তিনি ডিক্লাসড হবেন। মানসিকভাবে তিনি ডিক্লাসড হবেন। 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না'–এই কমরেডরা কারা ? তারা এলিট শ্রেণীরই সদস্যরা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডিক্লাসড, কেউ কেউ ডিক্লাসড না। যেমন তখন শুনেছি সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুর পরিবারে উনিই ছিলেন বামপন্থী। উনি কলকাতার ডকইয়ার্ডে ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। তিনি সেখানে যাওয়ার সময় খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি পরতেন। কিন্তু তাঁর কামরাতে সুগন্ধি ছড়িয়ে রাখা হতো। সুগন্ধি ছড়িয়ে তালা মেরে দেওয়া হতো, যাতে সুগন্ধি বেরিয়ে যেতে না পারে। তারপরে তিনি সারাদিন ট্রেড ইউনিয়নের কমরেডদের কাছে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে ঘর্মাক্ত অবস্থায় ফিরে এসে, স্নান করে, সেই সুগন্ধিগৃহে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করতেন। এই দ্বন্দ্বটা আমাদের মধ্যে রয়েই গেছে। আমরা যখন আমাদের শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসটি আছে, তা যখন হারিয়ে ফেলি, আমরা যখন অন্যভাবে জীবনকে দেখা শুরু করি, তখন প্রথমেই আমরা হারিয়ে ফেলি তথাকথিত ধর্ম বিশ্বাস। প্রথমে সেখান থেকে উদ্বাস্তু হই আমরা। দ্বিতীয়ত, আমরা নিজের শ্রেণীর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে সেখান থেকেও আমরা নিজেকেই নিজে নির্বাসিত করি। এখান থেকেও আমরা উদ্বাস্তু হই। শামসুর রাহমানের কথায়, 'কথা বানানোর আরক্ত কত তীক্ষ্ণ লজ্জা, বুকে পুষে আমি হাঁটি মানুষের ধূসর মেলায়...।' আমাদের শ্রেণী কী বলে ? তুমি ডাক্তার হবে, তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে, আর্কিটেক্ট হবে, ব্যবসায়ী হবে নিদেন পক্ষে। কিন্তু আমরা যখন এসব কিছুই করি না, নেহাতই পদ্য লেখি, তখন আশপাশের লোকজন আমাদের বলে, কি রে! আর কতকাল ভেরেন্ডা ভাজবি ? যার ফলে একটা এলিয়েনেশন তৈরি হয় মনের মধ্যে। সমসাময়িক কবিতায়ও দেখা যায় এই মানুষটাকে–'দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াই/কলকাতার মরা নগরীতে আসে আলকাতরার মতো রাত্রি/ আর হাওয়ায় গোলটেকের গন্ধ/ হে মহাকাল আর কত কাল'। এলিটিস্ট এটা এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ডিক্লাসড আমরা কেউ কি হতে পারি ? সে অর্থে পারি না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখ, শেষ জীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন, ভুপেন হাজারিকাকে দেখ, বিজেপি থেকে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে সত্যিকার অর্থে ডিক্লাসড হতে না পারলেও দার্শনিকভাবে আমরা কখনো কখনো ডিক্লাসড হতে পারি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : পাঠক...

শহীদ কাদরী : পাঠকও তো আমাদের নিজের শ্রেণীরই।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : সবাই কি ?

শহীদ কাদরী : অধিকাংশই তো নিজের শ্রেণীর পাঠক। আমি শুধু ঢাকায় একবার এক রিকশাওয়ালাকে পেয়েছিলাম যে সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করত।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এমন আমরা দু'চারজন পেয়েছি বটে। তবে এটা ঠিক, যারা পাঠক তারা এই পথেরই। তবে আমার মনে হয় আমাদের পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের রোমান্টিকতা আছে। তারা কবিতা পড়ার রোমান্টিকতা ছাড়াও আমাদের কবিদেরকে এরকম চেহারায় দেখতে ভালোবাসে।

শহীদ কাদরী এখানে আমি বলতে চাই বিপ্লবের চিন্তাও কিন্তু খুব রোমান্টিক। রোমান্টিসিজমের একটা মূল কথা হচ্ছে যা বর্তমান সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যেমন–'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'। পর্বত স্থিরাবস্থায় আছে। এই যে পর্বতের বৈশাখের মেঘ হতে চাওয়া এটা হলো পর্বতের রোমান্টিসিজম। বিপ্লবের চিন্তা অত্যন্ত রোমান্টিক। একটা অচলায়তন যেখানে রয়েছে যে সমাজ ব্যবস্থায় সেটাকে ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া–এটা অত্যন্ত রোমান্টিক চিন্তা। আমাদের রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ভাঙার কথা বলেছেন। রিয়্যালিজমও রোমান্টিসিজমের ওপরে আরও এক ডিগ্রি রোমান্টিক। কারণ সেটা রোমান্টিসিজম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভেঙে বেরিয়ে অন্য একটা ডাইমেনশনে যেতে চাইছে। রোমান্টিক মাইন্ড পৃথিবীর অগ্রগতির পক্ষে কাজ করছে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এখানে একটা মামুলি কথা বলা যাক, খুবই মামুলি–'ভালো কবিতা' কী ?

শহীদ কাদরী : দেখ, প্রথমত প্রতিটি ভালো কবিতার মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান যাকে বলে 'এলিমেন্ট অব এক্স' থাকে। যে জিনিসটি সরাসরি আঙুল দিয়ে শনাক্ত করা যাবে না। সৌন্দর্যের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে হারমনি। এই হারমনির চিন্তা থেকেই কিন্তু ইউরোপে এমনকি এখন আমাদের দেশেও সেরা সুন্দরী নির্বাচন করা হয়। সেখানে বুকের মাপ কত, কোমরের মাপ কত–যা গ্রিকরা প্রথম মেজারমেন্ট করে হারমনির কনসেপ্ট বের করে। হারমনি আমরা মিউজিকে পাচ্ছি, দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে পাচ্ছি, হারমনি আমরা কবিতার মধ্যেও পাচ্ছি। কবিতায় শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক, শব্দের সাথে সেখানে যে চিত্র আছে, চিত্রের সঙ্গে যে বিষয়বস্তু আছে, সেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে উপমা এবং ধ্বনিপুঞ্জের হারমোনাইজ সম্পর্ক থাকতে হবে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : পাঠক যখন কবিতা পড়েন তখন তো তার কাছে হারমনির এসব উপাদান ভিন্নভাবে আসে, একটা সমন্বিত রূপ উপস্থাপিত হয়। তাহলে কি বলা যায় পাঠকের যে কবিতা পড়তে ভালো লাগে, সেটিই তার কাছে ভালো কবিতা ?

শহীদ কাদরী : সেটি তার কাছে ভালো, কিন্তু অনেক কবিতা আছে যেগুলো পড়তে ভালো লাগে না, কিন্তু বোঝা যায় সেগুলো ভালো কবিতা। তবে শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষপাত হচ্ছে লিরিক, যদিও আমি নিজেও ঠিক মতো লিখতে পারি নি, কিন্তু আমার পক্ষপাত হচ্ছে লিরিক, মিউজিক্যালি রিচ লিরিক।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : এমন বলা যায়, কবি যখন তার আবেগ পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন না, তিনি তখন ব্যর্থ ?

শহীদ কাদরী : অ্যাবসুলিউটলি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : অথচ দেখা যাচ্ছে যে অনেক কবিই তাদের কবিতায় যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেন, যেমন মিল্টনের কথাই বলি, পাঠকের পক্ষে তৎক্ষণাৎ তার স্বাদ নেওয়া সম্ভব হয় না।

শহীদ কাদরী এখানে একটা কথা বলি, অনেক দিন পর্যন্ত কবিতা ছিল আবৃত্তির, কবিতার বাহন ছিল মৌখিক, তারপর কবিতার ওপরে একটা প্রধান প্রভাব পড়েছে ছাপাখানার। যতদিন পর্যন্ত কবিতা মৌখিক ছিল ততদিন পর্যন্ত কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সরলরৈখিক যা পাঠক বা শ্রোতা সহজেই গ্রহণ করতে পারত। যখন থেকে কবিতা ছাপা হওয়া শুরু হলো, কবিরা কবিতা লেখা শুরু করলেন, বিভিন্ন বিষয়ে এবং শাস্ত্রে তাদের মধ্যে পারঙ্গমতা জন্মালো। এদের চিন্তা আর সরলরৈখিক থাকল না। এদের চিন্তার মধ্যে জটিলতা এল। যেহেতু যে-কোনো শিল্প সৃষ্টি সামগ্রিক সত্তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্র বাংলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সাহিত্য সমাবেশে যোগদানকারী (বাম থেকে) মুহম্মদ জাফর ইকবাল, হাসান আল আবদুল্লাহ, নির্মলেন্দু গুণ, শহীদ কাদরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও আলেয়া চৌধুরী। নিউইয়র্ক, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

প্রকাশ, সেখানে চোখ, মুখ, কান, মন এবং মস্তিষ্ক যখন একসঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে কবিতার মধ্যে জটিলতা আসছে। কবিতার মধ্যে কবিতা সহজভাবে কথা বলছে না, কবিতা প্রতীক দিয়ে কথা বলছে, কবিতা পুরাণের উল্লেখ করে কথা বলছে, কবিতায় বৈজ্ঞানিক সূত্র ব্যবহার হচ্ছে–পাঠক যদি এগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত না হন, তার পক্ষে এটা বোঝা তো কঠিন হবেই। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে কিন্তু কাব্যের জটিলতা জড়িত।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এটাই সবচেয়ে বড় কথা। এটা ঠিক যে ছাপাখানা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বা কবিতা ছাপা হতে শুরু হওয়ার পর থেকে কবিতায় যে একরৈখিকতা ছিল তা দূর হয়েছে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাপনের জটিলতা কবির কবিতায় ছাপ ফেলে।

শহীদ কাদরী কারণ আমরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কিছুটা সময়ের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়ে যাই। আজকের সময়, আজকের সমাজ, আজকের বিশ্ব ব্যক্তিমানুষকে এমনভাবে গ্রাস করছে যে মানুষ সবকিছু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে চায়। ওই যে 'প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দেই'। অথচ প্রান্তরেই তো সবকিছু হচ্ছে। যুদ্ধ হচ্ছে প্রান্তরে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে প্রান্তরে, মহামারী-মড়ক হচ্ছে প্রান্তরে। কিন্তু আমরা প্রান্তর থেকে নিস্তার পেতে চাই। যখন আমরা প্রান্তর থেকে নিস্তার পেতে চাই, তখন আমরা এধরনের কথা বলি। আমি যদি সমাজ সচেতন হই এবং সক্রিয়ভাবে সমাজকে পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে তো আমাকে যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, মড়ক হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে সেখানে গিয়ে কাজ করতে হবে। দেখা গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অসংখ্য কবি যুদ্ধ করেছেন, বহু কবি নিহত হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আধুনিকতার আরেকটা কথা হচ্ছে আধুনিকতা সর্বগ্রাসী। আধুনিক শিল্প, আধুনিক সাহিত্য সবই সর্বগ্রাসী। সবই আমরা স্পর্শ করতে চাই। কিন্তু আমাদের রুচি, ক্ষমতার সীমা দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হই।

মাজহারুল ইসলাম : আমি ভালো কবিতা প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ভালো কবিতা নির্ধারণ করবে কে ? পাঠক না কবি নিজে ? পাঠকের ভূমিকা এখানে কতটুকু ?

শহীদ কাদরী : সবাই তো পাঠক। যে কবিতা লিখে সে নিজেও পাঠক। সে-ই শ্রেষ্ঠ পাঠক যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর স্বাদ নিয়েছেন। সেই পাঠকই শেষ পর্যন্ত কবিতার ভালোমন্দের বিচার করবে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : সহজ কথায় কি বলা যায় না, পাঠকই ভালো কবিতার বিচারক ?

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ, পাঠকই বিচারক, তবে সব পাঠক নন। কারণ আমরা দেখেছি পাঠক মনোরঞ্জনকারী কবিতাও আছে। আজকের এ যুগেও লেখা হচ্ছে পাঠক মনোরঞ্জনকারী কবিতা। এগুলো মোটামুটি সরল, ছন্দবদ্ধ, কোনো জটিলতা নাই, কোনো নতুনত্ব নাই। ভালো কবিতার তো অনেকগুলো শর্ত আছে। এর মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে আজ অবদি যে ধরনের কবিতা লেখা হয়েছে, আজকের পরে যারা লিখবেন তাদের অন্য ধরনের কবিতা লিখতে হবে, অন্য ধরনের সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে হবে। আবার সেখানে সৌন্দর্যের যেগুলো মূল কথা সেগুলো ঠিক রাখতে হবে। এ বিষয়গুলো ভালো কবিতার স্বাদ গ্রহণ করেছেন এমন বিশেষ ধরনের পাঠকরাই শুধু বিচার করতে পারবেন, সব পাঠক না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তাহলে কি বলা যায় ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের ভালো কবিতার ধারণা ভিন্ন ?

শহীদ কাদরী হ্যাঁ, বুদ্ধদেবের একটা প্রবন্ধ আছে রবীন্দ্রনাথের উপরে–'কবিতার সাত শরীর'। সেখানে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সাত ধরনের কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে সব ধরনের কবিতা আবার সবার পছন্দ নয়। এ নিয়ে মতদ্বৈততা তো আছেই। অনেক সময় দেখা যায় অনেক কবিকে তাঁর যুগে উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে, দু'শ তিনশ' বছর পরে তাঁদের সাহিত্য পুনর্জীবন পেয়েছে। এমন তো হয়ই। এটা ঔপন্যাসিকদের ব্যাপারেও হয়। জগদীশ গুপ্তের ব্যাপারে হয়েছিল। কত পরে জগদীশ গুপ্ত আমাদের কাছে এসেছিল। শিল্পসাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে এই সমস্যাটা থাকবে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : আমরা একটা কথা শুনে থাকি, কবি বা সাহিত্যিকের বিচার তাঁর রচনার পরিমাণ দিয়ে নয়, তাঁর রচনার গুণে।

শহীদ কাদরী আমি এখানে দু'তিনটা কথা বলব। রচনার পরিমাণটা কোনো পরিমাণ তা তো বলে দেন নি কেউ । যেমন, জীবনানন্দ দাশ যখন প্রধান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন তার 'বনলতা সেন' থেকে শুরু করে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত মাত্র একশ ষাটটি কবিতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আমাদের অন্যতম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রধান কবি...আমাকে যদি বলা হয় সত্যিকার তিন প্রধান কবি কে কে ? আমি বলব বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব বসু এবং অমিয় চক্রবর্তী আমার কাছে একটু পেছনেই থাকবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কিন্তু মাত্র পাঁচটি বই। অন্যদিকে বাংলাদেশী কোনো কোনো কবির ৬০-৭০টা বই ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে। পৃথিবীর মহাকবিদের মধ্যে র‍্যাবোকে ধরা হয় এবং বদলেয়ারকে ধরা হয়। বদলেয়ারের মাত্র ২টি বই। একদম চটি বই। র‍্যাবোর দু'টো বই। দুটিই চটি বই- 'ইলুমিনেশনস' এবং 'সিজন ইন হেল'। আবার..থাক.. আমি বাংলাদেশী কবিদের নাম বলতে চাই না। হাজার হাজার লিখলেই তো আর হবে না। ভালো কবিতায় অভিনবত্ব আছে, পুরনো জিনিসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা আছে। ভালো কবিতার সংখ্যা খুব কম। অত্যন্ত ছোট একটা দৃষ্টান্ত দেই। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি 'চাঁদমুখ'। মহিলাদের মুখের সৌন্দর্যের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করে বলা হয় 'চাঁদমুখ'। তারপর আমরা দীনেশ দাসকে পেলাম। তিনি লিখলেন, 'চাঁদের এই বাঁকা ফালিটি তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে/ এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে'। এর কিছুদিন পর পেলাম আমরা সুকান্তকে 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। প্রায় ওই ধরনেই আমরা পেয়েছি আল মাহমুদের কবিতায় 'হলুদ পিঠার মতো চাঁদ'। আর বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' কবিতায় চাঁদের অসংখ্য উপমা আছে। আবার কোনো একটা কবিতায় আমি পড়লাম যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত মানুষ পড়ে আছে, রাতে চাঁদ উঠেছে, মনে হয় আকাশে একটা নক্ষত্র। এ পর্যন্ত আমরা এসেছি। এর পরে কবিদের যদি চাঁদ ব্যবহার করতে হয় তাঁকে নতুন কিছু করতে হবে। একজন কবিকে যখন এগুতে হয় তখন নতুন কিছু করতে হয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় গ্রাম-বাংলার বর্ণনায় আমরা যে উপমা পাই তা রবীন্দ্রনাথেও নেই। এতে বিস্মিত হতে হয়। যখন কবিরা এভাবে যা কিছু স্পর্শ করবে সেখানেই নতুনত্বের ছাপ থাকবে–এভাবে কয় হাজার বই লিখতে পারবে ? চার-পাঁচটা বই-ই তো যথেষ্ট।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : কবিতার চেহারার কথা কিছু বলা যাক। মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে, আমাদের একরৈখিক কবিতার যে সময়কাল গেছে সেখান থেকে শুরু করে তারপর এ জটিল কবিতার সময় এল–এ দীর্ঘ সময়ে কবিতার চেহারা তো খুব একটা পাল্টাল না।

শহীদ কাদরী মঙ্গল কাব্যের পরে কবিতার চেহারা প্রথম পাল্টেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। চেহারা বলতে তুমি যদি ফরম্যাটের কথা বলো–রোমান্টিক কবিতার ফরম্যাটগুলো, স্তবক বিন্যাসগুলো রবীন্দ্রনাথের হাতে পাল্টেছে। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার ফরম্যাট খুব একটা চেঞ্জ হয় নি। ইউরোপে যেটা দেখা যায়–একটা হলো এক্সপোজিটরি পয়েম যেখানে কবিতার বিগিনিং আছে, মিডল আছে, এন্ড আছে। আরেকটা হলো কন্টিনেন্টাল প্রোজ পোয়েম যেটা টানা গদ্য। টানা গদ্য বাংলায় চেষ্টা করা হয়েছে। বুদ্ধদেব কিছু লিখেছেন, আরও কেউ কেউ লিখেছেন। কিন্তু মনে হয় টানা গদ্যে বাংলা কবিতা ঠিক দাঁড়াতে পারে না। কবিতার একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংজ্ঞায় অর্ডেন বলেছেন, Poetry is memorable speech. কারণ মেমোরেবল স্পিচ না বললে তো আবার শেক্সপীয়রকে আনা যাবে না কবিদের মধ্যে। টানা গদ্যের কবিতা মেমোরেবল হওয়া প্রায় অসম্ভব। যেহেতু আমরা এখন মেমোরির দাসত্ব করি না, যেহেতু বই খুলে কবিতা পড়ি, তাই টানা গদ্যে কবিতা হতেই পারে। র‍্যাবোর পুরোটাই টানা গদ্যে, পল ক্লোভেল টানা গদ্যে, এখনকার সময়ের রেনেসাঁ টানা গদ্যেই। বাংলায় অরুণ মিত্রের সব কবিতা টানা গদ্যেই। অরুণ মিত্রের ১ম খণ্ডটা আমি পেয়েছি, ২য় খণ্ডটা এখনো পাই নি। ভালো কবিতার কোনো আবেদন আমি সেখানে পাই নি। বুদ্ধদেব বসু অরুণ মিত্রের একটা কবিতা নিয়েছেন, বিষ্ণু দেও একটা-দুটো নিয়েছেন। টানা গদ্যে বাংলা কবিতা কেন যেন আসছে না। কীভাবে সেই ফরম্যাট চেঞ্জ হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। একসময় যখন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা শুরু হলো তখন রক্তকণিকার বিভিন্ন শেপ পেইন্টিংয়ে প্রভাব ফেলেছিল। এইভাবে কোনোভাবে কবিতার ফরম্যাট চেঞ্জ হবে কি না আমি বলতে পারব না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : কবিতার ফরম্যাট প্রসঙ্গে আবার চলে যাওয়া যাক।

শহীদ কাদরী : কবিতার ফরম্যাটে কিছু কিছু পরিবর্তন হয় নি যে তা না কিন্তু আসলে সেটা মৌলিক ফরম্যাটগুলোরই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। কিন্তু কবিতার মৌলিক ফরম্যাটে কোনো পরিবর্তন হয় নি। তুমি বলছিলে দীর্ঘ কবিতার কথা।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : দীর্ঘ কবিতার একটা প্রচলন হয়েছে। জয় গোস্বামী দীর্ঘ কবিতা লিখছেন। এ দীর্ঘ কবিতায় প্রায় উপন্যাস লেখা তো আগেও হয়েছে। যেমন, অন্নদামঙ্গল।

শহীদ কাদরী দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রথম দীর্ঘ কবিতা লিখলেন সৈয়দ শামসুল হক। সব দীর্ঘ কবিতার সমস্যা হচ্ছে দীর্ঘ কবিতার মধ্যে গদ্য বিষয় ঢুকে পড়ে। কারণ কবিতার অংশবিশেষ কাব্যিক থাকে আর কাব্যিক অংশগুলোকে এক সূত্রে গ্রোথিত করার জন্য কাহিনি আনতে হয়। যা কিছু অকবিতা কবিতার মধ্যে তা হচ্ছে কাহিনি। কাহিনি একটা ঔপন্যাসিক যত ভালোভাবে বলতে পারবে, একজন গল্পকার যত ভালোভাবে বলতে পারবে, একজন কবি কখনোই তত ভালোভাবে বলতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ কাহিনি কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাহিনি কবিতার যে আবেদন সেটা কিন্তু কাহিনির নয়, সেটা ছন্দমিল, অন্তমিলের সম্মোহনী শক্তির। কারণ কাহিনি হিসেবে সেটা সাধারণ কাহিনি। কাহিনি হিসেবে সেটা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ছোটগল্পের তুল্য না। জয় গোস্বামীর যে দীর্ঘ কবিতাগুলো আমি পড়েছি, কবিতা হিসেবে আমার কাছে সেগুলোর আবেদন নেই। জয় গোস্বামী ছাড়াও আরও অনেকের দীর্ঘ কবিতা আমি দেখেছি। দীর্ঘ কবিতার আবেদন আমার কাছে নেই। আমি মনে করি ছোট লিরিক অনেক দূর যেতে পারে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : গল্প এবং কবিতা, কবিতার চিত্রকল্প ইত্যাদি মিশিয়ে কিছু লেখা হয়, যেমন, আমি নিজে চেষ্টা করেছি...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী হ্যাঁ, আমি সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। একটা কথা তো সবসময়ই বলা হয়েছে, কবিতা এবং ছোটগল্প খুব কাছাকাছি জিনিস এবং কবিতা আক্রান্ত ছোট গল্প তো সাদরে গ্রহণযোগ্য। আমি তো খুবই পছন্দ করি তোমার এ ধরনের গল্পগুলো। তা ছাড়া অনেক বড় উপন্যাসও কবিতা দ্বারা আক্রান্ত। 'ইউলিসিস' কবিতা দ্বারা আক্রান্ত। ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাস কবিতা দ্বারা আক্রান্ত। তবে যারা শুধু কাহিনি চায়... এর পরে কী হলো, এর পরে কী হলো–তাদের জন্য এ জিনিসটা না। এর পরে কী হলো এটা হচ্ছে গোয়েন্দা কাহিনির মূল কাঠামো। আধুনিক কাহিনি তো আমরা প্রথম থেকেই জানি...এই হয়েছে... তারপর কী হবে শেষ, কীভাবে আবেগ অনুভূতিগুলোর উত্থান-পতন ঘটছে এবং ন্যাচারেলি আবেগ অনুভূতিগুলোর উত্থান-পতন ঘটাতে গেলেই সেখানে চিত্রকল্পের কথা আসে এবং এগুলো কবিতার উপাদান। আমার মনে হয় সত্যিকার ভালো শর্ট স্টোরি...যদি তুমি চেকভ'কে ধরো, তার শর্ট স্টোরির আড়ালে কি কবিতা নেই ? কাব্যিক দৃষ্টি তো থাকতে হবে–সে কবিতাই হোক, গল্পেই হোক, নাটকেই হোক আর উপন্যাসেই হোক।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : কবির জন্য পেশা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? অথবা বলা যায় পেশা কি কবিতাকে প্রভাবিত করে ?

শহীদ কাদরী : আমার ধারণা কবির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর পেশা সাংবাদিকতা। যে ভাষায় সে কবিতা লেখে সে ভাষায় দীর্ঘ দিন সাংবাদিকতা করলে সাংবাদিকতার ভাষা আক্রমণ করে তার সৃষ্টিশীল লেখায়।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : কিন্তু আমরা তো দেখি অনেক কবিই সাংবাদিক এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই পাঠকপ্রিয়।

শহীদ কাদরী হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে কবিতার বিষয়ে একটা কথা আসে–যা গদ্যে লেখা যায়, যা সম্পাদকীয়তে লেখা যায়, তা কিন্তু কবিতার বিষয় না। আমাদের এসব কবিরা অনেক কবিতা লিখেছেন যা বুদ্ধদেবের ভাষায়–বক্তৃতা, উপদেশ বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এবং এসব কবিতা অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে যায়, হতে বাধ্য এবং এটা হচ্ছে সাংবাদিকতার একটা প্রভাব। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করি, আজকের সভ্যতায়, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে লেখক-সাহিত্যিক-কবিদেরও একটা ভূমিকা পালন করতে হয়। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অনেক কথা, অনেক কিছু রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে, বুদ্ধদেবকেও বলতে হয়েছে। যেমন আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি সাংবাদিকতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও, ১৯৬৪ কি ১৯৬৬ সালে একটা বিরাট ঝড় হয়, সেই ঝড়ের ওপরে আমি একটা বেশ বড় কবিতা লিখেছিলাম যেটা আজকে আমার কাছে খুব বিবর্ণ মনে হয়, মনে হয় এর প্রাসঙ্গিকতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাংবাদিকতা অনেক সময় সাংবাদিক-কবিকে বাধ্য করে সময়ের তাৎক্ষণিকতা দ্বারা আক্রান্ত হতে। যেমন ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একসময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। সম্প্রতি আমি একটা বই পড়ছিলাম 'দ্য লেফট রাইটারস ইন আমেরিকা'। তাঁদের একটা ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব হয়তো আছে, কিন্তু ঠিক সাহিত্যিক গুরুত্ব আর নেই।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত পেশার কথাতেই আবার আসি, তোমার নিজের কথাই ধরা যাক। সেই সময়ে, কবিতা লেখার সেসব দিনে সেই অর্থে তোমার স্থির কোনো পেশা ছিল না। তারপরে আমরা যখন তোমাকে দেখলাম ঢাকা টেলিভিশনে কাজ নিতে। সেটিই যখন তোমার পেশা হয়ে দাঁড়াল, তখন তোমার লেখার যে অভ্যাস তা কি পরিবর্তিত হয়েছিল ? তুমি কি ঠিক মতো লিখতে পেরেছিলে তখন ?

শহীদ কাদরী তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, চার বছর কাজ করেছিলাম আমি সেখানে। তারপরে আমি আমার বড়ভাইকে বললাম, আমি সকাল ৯টা-সাড়ে ৯টা সময় যাই, রাত ১২টা-সাড়ে বারোটা সময় বেরিয়ে আসি, আমার দ্বারা এ চাকরি করে লেখালেখি করা সম্ভব হবে না, আমার বইও বের করা সম্ভব হবে না। টেলিভিশনে থাকতেই আমাকে আল মাহমুদ-এখলাস এসে বলল, ওরা আমার প্রথম বইটা বের করতে চায়। কিন্তু আমি তিন বছরের মধ্যে ওদেরকে কোনো পাণ্ডুলিপি দিতে পারি নি। যে কটা কবিতা লেখা হয়েছে সেই কবিতাগুলো আমার কাছে নেই। আমি সেগুলো সংগ্রহ করার সময়ও পাচ্ছিলাম না। আমার ভাই বললেন, এই যদি হয় তবে চাকরি করার দরকার নেই। আমার ভাই কোনো দিন আমাকে চাকরি করতে জোর করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, চাকরি করিস না, চাকরি ছেড়ে দে। টেলিভিশন থেকে আমি যখন রিজাইন করলাম টেলিভিশনের লোকেরা তখন খুব অবাক হয়ে গেল। সবাই এসে আমার বাসায় হাজির। বলল, এই চাকরি তুমি ছাড়ছ কেন ? এই চাকরি কেউ ছাড়ে! আমি বললাম, আমি তো চাই না টিভি প্রযোজক হিসেবে আমার পরিচিতি হোক। আমি টেলিভিশনে আর কাজ করব না। টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে প্রথমে আমার লেখাগুলো সংগ্রহ করলাম। এ ব্যাপারে আল মাহমুদ আমাকে সাহায্য করল, শামসুর রাহমান আমাকে সাহায্য করল। আমার অধিকাংশ কবিতা ওদের সাথে ছাপা হতো। ওরা ওদের কপি সংগ্রহে রাখত। এসব কপি চেয়ে চেয়ে প্রথম পাণ্ডুলিপি তৈরি করলাম। পাণ্ডুলিপি তৈরি করে আল মাহমুদকে দিলাম। টেলিভিশনে চাকরির সময়ে আমার লেখা তো হয়ই নি, এমনকি আমার লেখাগুলো যোগাড় পর্যন্ত করতে পারছিলাম না। 'সপ্তক'-এর সব কটা কবিতাই আমি প্রথম কবিতার বইতে নিয়েছি। কবিতায় আমার একটু ঘাটতিও ছিল। এমনকি শেষ যে কবিতা 'শহীদ কাদরী বাড়ি নেই' সেটা আমি কবিতার বইতে নিতে চাই নি। আমি ভেবেছিলাম লোকে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে। ওটা কেন আমি লিখলাম ? ওটা আমি লিখেছিলাম কারণ ভেবেছিলাম, একটা কবিতায় নিজের নাম যাওয়া উচিত। বুদ্ধদেব বসুর একটা কবিতা ছিল, 'বুদ্ধদেব বসু, একদা ছিলেন শিশু, যখন তিনি যুবক হলেন, লোকে বলত পশু, বুদ্ধদেব বসু'। ওদিকে আবার আবিষ্কার করলাম অ্যালিয়েটরেরও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজের ওপর একটা ছড়া আছে। আমি ভাবলাম আমারও দরকার এমন একটা নিজের কবিতা, নিজের নামে। I just wrote it. I never mean it seriously. কিন্তু পরে দেখলাম, সেখানে একটা সিরিয়াস কথাও আছে। ওই কবিতাটায় আমি বলতে চেয়েছি যে, আমি একজন বিপদগ্রস্থ মানুষ। শহীদ কাদরী বাড়ি নেই, শহীদ কাদরী ঘুরে বেড়ায়, শহীদ কাদরী আড্ডা মারে আমি সেটা বোঝাই নি। কবিতা যখন শর্ট পড়ছে আমি দু'তিনটা কবিতা যেগুলো আমি নিতে চাইনি বা ভেবেছিলাম পুনর্লিখিত করব কিন্তু সময় ছিল না, ওই অবস্থায়ই দিয়ে দেই। তারপরে আবার যখন এপিএনে যোগ দিয়েছিলাম, তখনো আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি ওই ধরনের লোক ছিলাম যার জন্য শৃঙ্খলহীন অবস্থায় না থাকলে কবিতা হতো না। আর সত্যি কথা বলি– আমার বই বেরুবে, হেন হবে, তেন হবে আমি ভাবি নি। বাড়িতেও হাসাহাসি করত সবাই। আমি আমেরিকাতে আসার পর ভাইয়া একদিন বলেন, শহীদ তুমি লেখো না কেন আজকাল ? আমি ভাইয়াকে বললাম, তুমি যদি একথা আমাকে ঢাকাতে বলতে তবে তো আমি তো কখনো ঢাকা ছাড়তামই না। তোমাকে একটা কথা বলি এই খানে, তখন খুব জোর চলছে বঙ্গবন্ধুর নন-কোঅপারেশন আন্দোলন। আমি যাচ্ছি নানা জায়গায়, রাতে বাসায় ফিরছি। ২২ তারিখ হয়ে গেল, জোর গুজব মিলিটারি ক্র্যাক ডাউন হবে। এর মধ্যে আমি তো টেলিভিশনে অনেক প্রোগ্রাম করেছি, ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রোগ্রাম করেছি, সিআইডিরা ছবি তুলেছে। আমি ভাইয়াকে বললাম, আমাদের বাসায় থাকা ঠিক হবে না। আমি টিভিতে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রোগ্রাম করেছি। আমাদের বিপদ হতে পারে। তখন ভাইয়া হাসে। হেসে বলে, তুমি তো নিজেকে প্রমোশন দিচ্ছ, আর্মি যদি খুঁজে তো শামসুর রাহমানকে খুজবে, তোমাকে খুঁজবে না। এই করতে করতে ২৩ তারিখ এসে গেল। আমাদের পাশের বাড়িতে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল দোকান ছিল, ওখানে ছেলেরা হাত বোমা বানাচ্ছে। আর্মি এলে মারবে। আমি কোথায় পড়েছি যেন, কোনো এলাকায় আর্মির ওপর আক্রমণ করা হলে, সেখানে আর্মি ঘরে ঘরে ঢুকে ঢুকে মারে। আমি বাসায় এসে ভাবিকে বললাম, আপনি যদি বাচ্চাকে নিয়ে প্রাণে বাঁচতে চান, তাহলে বাচ্চাকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যান। ভাইয়া সুড়সুড় করে আপনার পেছনে চলে যাবে। ঠিকই ভাবি বুঝতে পারল। আর আমি গেলাম এক কাজিনের ওখানে। তারপর ক্র্যাকডাউন হলো। তো, ভাইয়া কখনোই আমার কথা সিরিয়াসলি নেয় নি। শুধু ওই একবারই আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, তুই চাকরি ছেড়ে দে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তুমি নিজে বলো, তোমার কি ক্ষতি হয় নি পেশাগত জীবনে থাকার ফলে ?

শহীদ কাদরী : অনেক ক্ষতি হয়েছে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : শহীদ, ঢাকা টেলিভিশনের চাকরিই কি তোমার সেই অর্থে প্রথম নিয়মিত চাকরি ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ, ওটাই প্রথম চাকরি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তার আগে কী করতে ? কবিতা রচনা ? পাঠাভ্যাস কী ছিল ?

শহীদ কাদরী : পাঠাভ্যাস আমার অনিয়মিতই ছিল। আসলে আমাদের বাড়ির স্কলার তো আমার বড়ভাই। তাঁর প্রভাবে পাঠাভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। আর খুব ছেলেবেলাতেই যে আমি লেখালেখির চেষ্টা করি নি তা নয়। একবার আমার হাম হয়, তখন আমি শুয়ে থাকতে থাকতে দু'চারটা পদ্য বানাই। সেটা আবার বাবাকে শোনাই। বাবা আবার পদ্যটা একটু ঠিকঠাক করে দেয়। বলে দেয় এইভাবে এইভাবে করো। এ ছাড়া মাঝে মাঝে আমার ভাই বলত একটা গল্প তোকে পড়ে শোনাই, এটা আনসু ভাই লিখেছে। আনসু ভাই হলো আনিস চৌধুরী। আনিস চৌধুরী সম্পর্কে আমার ফুফাত ভাই। আনিস ভাই তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন আর ছোটগল্প লিখতেন। ভাইয়া আবার গল্পগুলোর চরিত্রগুলো সনাক্ত করত যে অমুক চাচার চরিত্র আছে এই গল্পে। আমার ভাই যখনই যেটা পড়ত, যেটা তাঁর ভালো লাগত, ইংরেজি এবং বাংলায়, আমাকে পড়ে শোনাত। যখন যে সিনেমা দেখে তার পছন্দ হতো, আমাকে পয়সা দিয়ে সে সিনেমা দেখতে পাঠাত। আমি তো জানতাম যে লেখকরা লেখে। এ সময় রাজধানীতে ঝড় বেরুল আবু রুশদ মতিনউদ্দিনের। উনি সম্পর্কে আমার চাচাত ভাই হন। ওটা নিয়ে খুব হইচই হলো। শুনলাম আবু রুশদ কিতাব লিখতা হে, আবু রুশদী কিতাব লিখতা হে। এগুলো আমার মনে ছাপ ফেলেছিল। তারপর ঢাকায় এলাম।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : ঢাকায় এলে কবে ?

শহীদ কাদরী ভাষা আন্দোলনের ঠিক আগে। আসার মাসখানেকের মধ্যেই গোলাগুলি হলো।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তাহলে বায়ান্নোর গোড়ার দিকে ?

শহীদ কাদরী হ্যাঁ, আমার মনে আছে, আমি পাকিস্তান অবজারভারের ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওখানে গুলি হলো। তখন দৌড়ে এসে বাড়ির ছাদে উঠলাম এজন্য যে ছাদ থেকে কিছু দেখা যায় কিনা। ছাদ থেকে কিছু দেখা গেল না। সেই ঘটনার পরে আমার একটা অংকের খাতাতে কয়েকটা মকশো করেছিলাম।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তুমি কত বড় তখন ?

শহীদ কাদরী আমার তখন ১২-১৩ বছর হবে। আর একটু কমও হতে পারে। পঞ্চাশের দশকের দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়ির পাশে একটা পরিবার এল। খোকন নামে একটি ছেলে ছিল, তার সঙ্গে আমার বড়ভাইয়ের খুব বন্ধুত্ব হলো। খোকনরা তো সাতচল্লিশেই চলে এসেছে। আব্বার মৃত্যুর পর আমরা এসেছি ঢাকাতে। আমার মা তো বর্ধমানের। মায়ের দিকের আত্মীয়রা বলছিলেন ঢাকায় যাওয়ার তো কোনো দরকার নেই। অন্যদিকে আমার বাবার এক ভাই আর এক বোন। তাঁরা বললেন যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

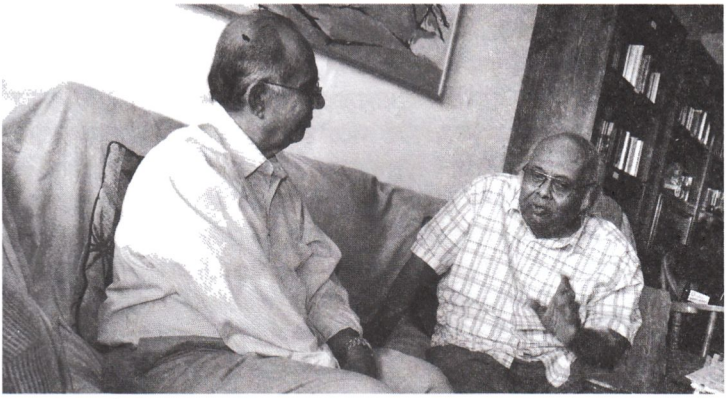

কবি শহীদ কাদরীর মুখোমুখি জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

আমাদের ঢাকায় যেতেই হবে। আমরা তাই বাধ্য হলাম আসতে। আসার পর হঠাৎ দেখি একদিন কেউ বাইরে থেকে শাহেদ শাহেদ বলে ডাকছে। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি যে খোকন। খোকন জানাল আনিস ভাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছে । সে বোধহয় কবিতা লেখে তখন। সে বলল, তুই শামসুর রাহমানের কবিতা পড়েছিস ?

–'না তো।'–'নাম শুনেছিস ?'–'না তো, আমি নাম জানি না।'–'আরে তাঁর তো দেশ পত্রিকায় প্রত্যেক সপ্তাহে কবিতা ছাপা হয়। দেশ পত্রিকায় কখনো দেখিস নি ?'–'না তো।'–'আরে বাচ্চু ভাইকে তো আমি তোর কথা বলব।'

এই বলে খোকন চলে গেল। এর মধ্যে আমার সঙ্গে এক কাজিন, সে সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক ছিল, কবি প্রজেশ কুমারের কথা প্রায়ই বলতেন। প্রজেশ কুমার রায়ের কথা তোমার মনে আছে ?

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, আছে।

শহীদ কাদরী উনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন 'চয়নিকা' পড়তে। লাল মলাটের 'চয়নিকা'। তারপর মহিউদ্দিন আহমদ নামে উনার এক বন্ধু ওয়ারী থেকে 'স্পন্দন' পত্রিকা বের করলেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এই মহিউদ্দিন আহমদই আহমদ মীর। এই আহমদ মীরই শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতার বই 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশ করেন 'বার্ডস অ্যান্ড বুকস' থেকে।

শহীদ কাদরী হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, মহিউদ্দিন ভাইয়ের পত্রিকাতেই আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার নাম ছিল 'পরিক্রমা'। পুরোপুরি তখনকার মার্কসিস্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতার নকল। তারপর আবার ওখানেই আমার দ্বিতীয় কবিতা ছাপা হয়–'জলকন্যার জন্য'। সেখানে আমি মার্কসিস্ট কবিতা থেকে কিছুটা সরে এসেছি। 'জলকন্যার জন্য' যখন প্রকাশিত হলো, তখন শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার আলাপ হয় খান মজলিসের বুক স্টলের ওখানে। কারণ আমি প্রায়ই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, দেখতাম যে কেউ *স্পন্দন* খুলে আমার কবিতাটা পড়ছে কি না। একদিন দেখি শামসুর রাহমান *স্পন্দন* খুলে কবিতা দেখছেন। আমি অধীর আগ্রহে ঝুঁকে দেখছি উনি কোন কবিতাটা পড়ছেন। শামসুর রাহমান মুচকি হেসে আমার দিকে তাকালেন। আমি আর পারলাম না। আমি বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার কাছে কেমন লাগল 'জলকন্যার জন্য'। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি শহীদ কাদরী ? আপনার কথা তো আমাকে খোকন বলেছে। আমার পকেটে একটা টাকা ছিল। আমি দেখলাম আলাপটাকে দীর্ঘায়িত করা দরকার। তো রিভার ভিউ ক্যাফে নামে একটি ক্যাফে ছিল সদরঘাটে। আমি বললাম, চা খাবেন ? উনি বললেন, হ্যাঁ। রিভার ভিউ ক্যাফেতে তখন চা চার আনা করে কাপ। দু'আনা করে একটা বিস্কুট পাওয়া যেত যার মধ্যখানে চকলেট দেওয়া থাকত। চা-বিস্কুট নিয়ে বসলাম। তখন কিন্তু আমার পকেটে আরেকটা কবিতা। কথার ফাঁকে বললাম, আমার কাছে আরেকটা কবিতা আছে, আপনি শুনবেন ? উনি বললেন, হ্যাঁ। আমি কবিতা বের করলাম। শামসুর রাহমান নিল। সেখানে একটা লাইন ছিল, 'মেয়েটা সারারাত জেগে ভুল ব্যাকরণে কবিতা লেখে'। শামসুর রাহমান আমাকে বললেন, আপনার ভুল বানানটা কিন্তু ভুল। এই কথা শুরু হলো। সেখান থেকে কথা বলতে বলতে তার আশিক লেনের বাসায় যাই। সেখানে তিনি তার ছাপা হওয়া কবিতার একটা বান্ডিল নামালেন। একটার পর একটা কবিতা পড়ে শোনালেন। এরমধ্যে ওই বছরই একটা ঘটনা ঘটলো। ভাইয়া গিয়েছিলেন কলকাতায়, ভাইয়া প্রতিবছরই কলকাতায় যেত, আমার অন্যান্য চাচাত ভাইরা কলকাতায় থেকে গিয়েছিল, তার মধ্যে একজন ছিল বিষ্ণু দের ছাত্র, আবুল হায়াত ভাইয়া। আবুল হায়াত ভাইয়া ভাইয়াকে বিষ্ণু দের কবিতা পড়ে পড়ে শোনাত। সেখান থেকেই ভাইয়া বিষ্ণু দের ভক্ত হয়ে যায়। ভাইয়া বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রত্যেকের গুচ্ছ গুচ্ছ বই নিয়ে ঢাকায় ফিরল। তো তারপর কবিতা পড়ছি, কবিতা পড়ছি, দিন রাত পড়ছি কবিতা। এরই মধ্যে একজনের আমন্ত্রণে 'সওগাত' অফিসে গিয়ে দেখি ওখানে সব বড় বড় লেখক–বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, খালিদ চৌধুরী সব ওখানে। তখন *সওগাত* পত্রিকা চালাচ্ছিল আবদুল গাফফার চৌধুরী। আবদুল গাফফার চৌধুরী একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি কলকাতার ছেলে, আমি শুনলাম কলকাতার ছেলেরা নাকি ইংরেজিতে ভালো। এই প্রবন্ধটা অনুবাদ করে আইনো তো মিয়া।' *স্টেটসম্যান*-এ একটা ইংরেজি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল লীলা রায়ের– Contemporary Bengali Poetry. এতে শামসুর রাহমানের উপরে অনেকখানি ছিল। তো আমি সেটা অনুবাদ করে নিয়ে গেলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর বললাম একটা কবিতা দেব। দিলাম কবিতা একটা। তারপর আবার ওই একই কবিতা 'গোধূলির গান' দিলাম *পূর্বাশায়*। *পূর্বাশায়* ছাপা হয়ে গেল ওটা। তখন আমার মা বেঁচে। আমি ক্রিকেট খেলে বাসায় ফিরছি। ফিরে দেখি আম্মার কাছে রাখা *পূর্বাশা*। কয়েক ডজন কবির সাথে ছাপা হয়েছে আমার কবিতা। এরকম চলছে। এর মধ্যে একদিন *সওগাত* অফিসেই আল মাহমুদের সাথে দেখা। আল মাহমুদ একবারে সদরঘাটে নেমেই *সওগাত* অফিসে। ওই যে আমি লিখেছি না, 'আল মাহমুদ এক হাতে তার ঐ টিনের সুটকেস'..ও আহত হয়েছিল এ টিনের সুটকেসটা লেখায়।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : (হেসে) তখন তো টিনের সুটকেসই ছিল।

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ। তো, *সওগাত* অফিসে আল মাহমুদ এল। তো চোখ টিপাটিপি হলো, লোকজন এটাসেটা কথা বলল। কিন্তু তখন অলরেডি *সওগাতে* মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে ওর একটা কবিতা ছাপা হয়–'অধ্যাপক তবুও কান্না পায়'। ইট ওয়াজ অ্যা নাইস পয়েম। কিন্তু লোকজন চোখ টিপাটিপি করলো ওকে দেখে। আমি আর আল মাহমুদ *সওগাত* থেকে বেরিয়ে এলাম। অনেক কথা বলতে বলতে আল মাহমুদের সাথে গেলাম নবাবপুরে, যেখানে ও উঠেছিল। ওর সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব হল। অন্যদের কারও সাথে তাঁর ঠিক হৃদ্যতা হয় নি। তো, একদিন আমি শামসুর রাহমানের বাড়ি থেকে–আশিক লেন থেকে ফেরার পথে আবার আল মাহমুদের ওখানে ঢুকেছি। দেখি সে লেখালেখি করছে । বললাম, কী রে দোস্ত, কী করিস ? বলে, আমি শামসুর রাহমানের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এসেছি 'কবিতা' পত্রিকার, 'কবিতা' পত্রিকায় কবিতা পাঠাচ্ছি। সেদিন বিকেলে শামসুর রাহমান এসেছে। আমি শামসুর রাহমানকে বললাম, আল মাহমুদ তো কবিতা পাঠালো 'কবিতা' পত্রিকায়। ওর তো 'কবিতা' পত্রিকায় আমার আগে কবিতা ছাপা হয়ে যাবে। শামসুর রাহমান বললেন, খাতা বের করেন আপনি। খাতা বের করে দিলাম। একটা কবিতা দেখিয়ে বললেন, এটা পাঠান। আরেকটা দেখিয়ে বললেন, এটা পাঠান। আমি ওই কবিতাদুটো কপি করে পাঠিয়ে দিলাম ওই দিনই। একসাথে সবার কবিতা ছাপা হয়ে গেল। নেক্সট ইস্যুতেই। শামসুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী। অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু যে দিন সেই সংখ্যাটা আমার হাতে এল, তার আগের রাতেই আমার মা মারা গেল। আমি কবরস্থান থেকে ফিরে স্নান করে বিউটি বোর্ডিংয়ে এসে একা বসে আছি। টেবিলে মাথা রেখে আমি বসে আছি চুপচাপ। হঠাৎ দেখি পিঠে কার হাত পড়ল। মাথা তুলে দেখি শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমান বললেন, আপনার কবিতা তো ছাপা হয়েছে। দুপুরে আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। দেখলাম অনেক লোকের ভিড়। এরমধ্যে পিয়ন এসে পত্রিকাটা দিয়ে গেছে। ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারত তাই আমি নিয়ে এসেছি। দেখলাম সংখ্যাটা। ভালোই লাগল। এ ঘটনাটা আমার লেখায় কিছুটা ইনটারাপ্ট করেছিল। তো এরকম আমার মাঝে মাঝেই গ্যাপ পড়েছে। আমার মধ্যে আরেকটা সমস্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল, কোনো কিছু মাথায় এলে রিজেক্ট করার টেন্ডেন্সিটা বেশি ছিল। ভাবতাম, ধুর এটা কী, এটা তো আগেই হয়ে গেছে। আর আমার দ্বারা কবিতা হবে, কবিতা লিখব আমি এধরনের খুব জোরালো কোনো ব্যাপার ছিল না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তখনো তো শামসুর রাহমানের কবিতার বই বের হয় নি ?

শহীদ কাদরী : না, তখনো বের হয় নি। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' আমার সামনে ছাপা হয়েছে। আমি দেখেছি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'-এর প্রুফ পাঠক ছিলাম আমি। আহমদ মীর সাহেবের প্রকাশনা 'বার্ডস অ্যান্ড বুকস'-এর একমাত্র কর্মচারী বলা হোক আর সহায়ক বলা হোক, সে আমিই ছিলাম। আর তোমার বইটি..একসঙ্গে তিনটি বই বের হয়, শামসুর রাহমানের 'রৌদ্র করোটিতে'..

শহীদ কাদরী : না, না শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা'

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : না, না। বইঘর থেকে যেটা বের হয়।

শহীদ কাদরী : 'বিধ্বস্ত নীলিমা'ই।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : 'বিধ্বস্ত নীলিমা', তোমার 'উত্তরাধিকার' আর আল মাহমুদের 'কালের কলস'। এই ৩টি বই যখন একসঙ্গে প্রকাশিত হয় বইঘর থেকে, তখন আমরা ধরে নেই এই হচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতার শুরু। এবার এক ভিন্ন প্রসঙ্গ তুলি। কবির জন্য কোনটি সহায়ক–শুদ্ধাচারী জীবন না অমিতাচারী জীবন ?

শহীদ কাদরী : আমরা জগতে দুই ধরনের কবিই দেখেছি। এটা আসলে নির্ভর করবে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। শুদ্ধাচারী কবি যে ধরনের কবিতা লিখবে, অমিতাচারী কবির কবিতা কিছুটা হলেও ভিন্ন হবে। তবে আমি বলব, কবির জীবন কিছুটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া দরকার। তা না হলে অসংযম, শৃঙ্খলাহীনতা দ্বারা কবিতা আক্রান্ত হয়, সেটা খুবই ক্ষতিকর হবে। একটা চমৎকার উপন্যাস আছে বুদ্ধদেবের, পড়েছ কি না জানি না–'যবনিকা পতন'। দুই বন্ধু, দুজনই কবি। একজন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, নিয়মিত পড়াশোনা, লেখালেখি করে; অন্যজন মদ্যপ, জুয়া খেলে, টাকা উড়ায়, টাকা ধার করে এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ লেখে, মধ্যপথে লেখা বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত নেশার ঘোরে কাউকে হত্যা করে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : মোটামুটি শুদ্ধাচারী তাকেই বলা যায়, যে জীবনযাত্রায় নিয়মিত। শুদ্ধাচারী কবির সংজ্ঞায় আরেকটু যোগ করা যায়–যে নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে অতিশয় শৃঙ্খলাবদ্ধ।

শহীদ কাদরী : অ্যাকজাক্টলি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : অনেক কবি এবং পদ্য লেখকও আছেন যারা নিয়মিত, একদম অফিস করার মতো করে কবিতা লিখেছেন। আরেক দল আছে যাদের লিখবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো শৃঙ্খলা নেই, যখন ইচ্ছে লিখছে আবার লিখছেন না, দীর্ঘকাল লিখছেন না...

শহীদ কাদরী তবে, আধুনিক যুগে এ কথা বারবার এসেছে যে অনুপ্রেরণার অপেক্ষায় লেখক বসে থাকবেন না। সুধীন দত্ত একটা কথা বলেছেন, আমরা এমন একটা সময়ে উপস্থিত হয়েছি যে, সমস্ত কবিকে বিশ্বম্ভর হতে হবে, সমস্ত বিশ্ব থেকে তাকে বীজ এনে রোপণ করতে হবে। তো আজকের দিনে কোনো কবি বা লেখক যদি নিয়মিত না হন, নিয়মিত লেখার চেষ্টা না করেন, স্বভাবতই তার লেখার মধ্যে নানা ধরনের ত্রুটি দেখা যাবে। এ দৃষ্টান্ত তো আমাদের বাংলা সাহিত্যেই আছে। কিছুটা নজরুলের মধ্যেই আছে বলা যেতে পারে। আমি মনে করি কবিদের তাই শুদ্ধাচারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি নিজেই যদি একটু শুদ্ধাচারী হতাম, তাহলে তো ভালোই হতো। আমি এমনকি যারা লেখা নিয়ে খুব বেশি সিরিয়াস ছিলেন তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টাও করতাম। কিন্তু তখন বুঝি নি যে সময় আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অন্যরা অনবরত লিখে যাচ্ছে। অনেক সময় অবাক হতাম যে তারা আড্ডাতে নেই, আড্ডা থেকে আটটার সময় চলে গেল ঘরে। হাসাহাসি করতাম এসব নিয়ে। আমরা যারা হাসাহাসি করতাম তাদের কেউই ঠিকমতো লেখে নি, একটু একটু আমিই লিখতাম, মাঝে মাঝে লিখেছি। কোনো সময়ই আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সুশৃঙ্খলভাবে লিখি নি। আজকে এটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি যে লেখকদের নিয়মিতভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে লেখা উচিত। বুদ্ধদেব সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বই বেরিয়েছে 'বুদ্ধদেব ও সারস্বত সমাজ', তার কন্যা মিনাক্ষী দত্তর লেখা। সেখানে একটি রচনা আছে 'বুদ্ধদেবের একটি দিন'। বুদ্ধদেব সকালবেলায় উঠে ক্ষৌরি করে চা খেয়েই লিখতে বসে যেতেন। দুপুর পর্যন্ত লিখতেন। তারপর ইজিচেয়ারে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। তারপর আবার তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখতেন। সন্ধ্যার পর আড্ডা। বুদ্ধদেবের বন্ধুবান্ধবেরা আসত, তরুণ লেখকেরা আসত সেখানে। কোনো কোনো দিন রাতেও লিখতে বসতেন। তবে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সকাল থেকে লিখতে বসতেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছি ভোরে উঠে তার আলাদা লেখার কামরায় লিখতে বসে যেতেন। ৫টা-৬টা থেকে প্রায় ৯টা-১০টা পর্যন্ত লিখতেন এক নাগাড়ে। তারপর স্নান করে চলে যেতেন *আনন্দবাজার* পত্রিকায়। ওখান থেকে বের হতে বিকাল ৫টা বাজে। তারপর সোজা চলে যেতেন কোনো বারে। বারে ধীরেন চক্রবর্তী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যেত। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় অনুরোধ করলেই নির্দ্বিধায় গান শোনাতেন। গলাটা ভালো নেই, হারমোনিয়াম নেই ওসব কিছু ছিল না। সুনীল বারে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর বাসায় ফিরে আবার অন্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ নিয়ে বসতেন। মধ্যরাত পেরিয়ে যেত প্রায়ই। কোনো কোনো দিন বার থেকেই ১২টা-১টায় ফিরতেন। কিন্তু যত রাত পর্যন্তই বারে থাকুক না কেন ভোর ৫-৬টা থেকে প্রতিদিন ৯টা-১০টা পর্যন্ত লিখতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তাঁর জীবনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা আছে। কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলাটিও শৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে।

শহীদ কাদরী আমি শামসুর রাহমানকেও দেখেছি নিয়মিত লিখতে। আমার মনে আছে একদিন সন্ধ্যায় আমরা কোথাও গিয়েছিলাম কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে। ফিরে এসে দেখি আমাদের বাড়ির সামনে লাইটপোস্টের নিচে শামসুর রাহমান খুব দ্রুত পায়চারি করছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে শামসুর রাহমানকে বললাম, কী ব্যাপার ? আপনি কতক্ষণ হয় এসেছেন ? শামসুর রাহমান বললেন, অনেকক্ষণ। চলেন যাই বসি। বসে শামসুর রাহমান বললেন, আমি আজকে প্রায় সপ্তাহখানেক হয়ে গেল একটা লাইনও লিখতে পারি নি। খুব মন খারাপ ছিল তার। সৈয়দ শামসুল হককেও আমি দেখেছি ভোরে উঠে লিখতে বসতেন। আর রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয় এ কারণে যে রবীন্দ্রনাথ এত কিছু লিখেছেন, শুধু নাটকই এত পরিমাণ লিখেছেন! আর রবীন্দ্রনাথ তো পড়েছেনও। আমি কার লেখায় যেন পড়লাম যে তিন-চারটে বই রবীন্দ্রনাথের টিপয়ের উপরে থাকত বাম দিকে। সকাল বেলায় দেখা যেত বইগুলো ডান দিকে। অর্থাৎ বইগুলো পড়া হয়ে গিয়েছে। বইগুলো এখন লাইব্রেরিতে চলে যাবে। একরাতে রবীন্দ্রনাথ ৩-৪খানা বই পড়ে ফেলতে পারতেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আসলেই ভাবলে অবাক হতে হয়। যে পরিমাণ রচনা তিনি লিখেছেন তার সাথে তিনি যে অন্য যেসব কাজও করেছেন!

শহীদ কাদরী কত কী করেছেন! ছোটগল্প, উপন্যাস। আমাদের প্রথম আধুনিক উপন্যাসই তো রবীন্দ্রনাথের। হাজারের উপরে তো ছবিই এঁকেছেন। গান! শুধু অসংখ্য গান লেখেন নি সুরও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো বহুপ্রসূ ছিলেন গ্যেটে। ইউরোপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের তুল্য বলা যায় গ্যেটেকে। আমাদের কী হবে ? এসব কথা যখন পড়েছি তখন আমরা সেভাবে শিল্প-সাহিত্য করব এমন ভাবনাই আমাদের মধ্যে ছিল না। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের কথা না বলে পারছি না। শামসুর রাহমানের বাবা শামসুর রাহমানের কবিতা লেখা খুব অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন শামসুর রাহমান সিএসপি দিক বা ব্যারিস্টারি পড়ে আসুক বা বিজনেসে বসুক। শামসুর রাহমান কোনোটাতেই রাজি হন নি। তারা বেশ ধনীই ছিলেন। সেই সময় শামসুর রাহমান রেডিওতে চাকরি নিল, দু'শ আড়াইশ টাকার চাকরি। হেঁটে যায়, হেঁটে বাড়িতে ফিরে। শামসুর রাহমান ভেবেছিলেন বাবার পছন্দ অনুযায়ী কোনো কাজ করতে হলে তাঁর লেখালেখি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর একসময় পাকিস্তান সরকার চেষ্টা করছিল বাংলাদেশের লেখকদের কেনার। তখন শামসুর রাহমানকে অফার করেছিল সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিস দিয়ে *মাহেনও*-এর সম্পাদক করতে। শামসুর রাহমান তখন *মর্নিং নিউজ*-এর সাব-এডিটর। তাকে কোনো রকম লোভ নড়াতে পারে নি। নিয়মিত লিখেছেন তিনি। আমার উপর খুব ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন তিনি যখন আমি নিয়মিত লিখি নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

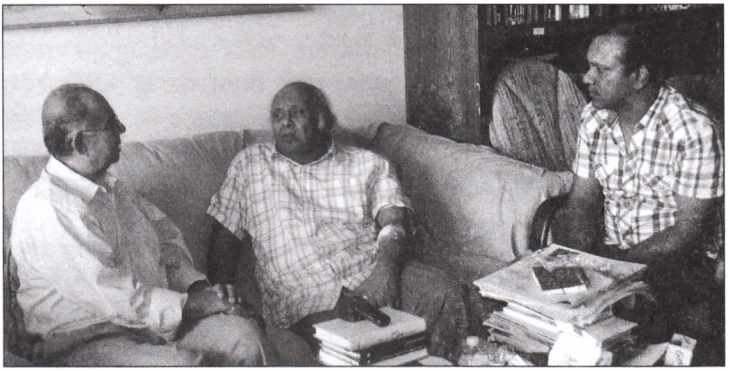

একান্ত আলাপচারিতায় জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, শহীদ কাদরী ও মাজহারুল ইসলাম

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এ থেকে একটা কথা বোঝা যায় লেখকের নিজের রচনার প্রতি প্রেম থাকতে হয়, সংকল্প থাকতে হয়, সেই সঙ্গে নিষ্ঠা থাকতে হয়।

শহীদ কাদরী আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে শামসুর রাহমান, আপনি কি মনে করেন আমার দ্বারা কবিতা হবে ? শামসুর রাহমান আমাকে বলল, দেখেন আমি দেখতে পাই আপনার মধ্যে দুটো শক্তি কাজ করছে। একটা আপনার লেখার পক্ষে আর একটা বিপক্ষে। যে শক্তিটা জিতবে সে অনুযায়ী আপনার কবিতা হবে। আপনি যেভাবে চলছেন সেভাবে তো মানুষ লেখা বন্ধ করে দেয়। আমার তখন চিন্তা ছিল, একে তো বাংলা কবিতা, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তান, এমন কিছু হলে কীইবা আসে যায়–এমন একটা ভাবনা ছিল। এরকম একটা ব্যাপারের সঙ্গে ভাইয়ার একটা উন্নাসিকতাও কাজ করেছিল। ভাইয়া আমাকে এলিয়ট পড়ে শোনাচ্ছে, এলিয়টের ওপরে বিষ্ণু দের প্রবন্ধটা পড়ে শোনাচ্ছে, আমার মনে হতো–ওরে বাবা আমি তো ওইখানে কখনো পৌঁছাতে পারব না! এজন্য ক্ষণজন্মা হতে হয়।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এই যে শুদ্ধাচারী কবি অমিতাচারী কবি নিয়ে কথা বলছি, প্রায় কাছাকাছি একটি বিষয় নিয়ে কথা বলি। কবির ব্যক্তিগত জীবনও তো কবিতায় ছাপ ফেলে ?

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ, ফেলে। তবে সবসময় ফেলে না। একটি কথা আমি বলব, এ কথা অনেকদিন থেকে প্রচলিতই আছে–সব উপন্যাসই লেখকের ছদ্মবেশী আত্মজীবনী। রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, গানের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক গুজব, গল্প এবং কাহিনির বীজ এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ নিয়ে এখনো প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। আমি বলব ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই লেখায় ছায়া ফেলে। কখনো কখনো ছদ্মবেশী অবস্থায় থাকে, কখনো কখনো সরাসরি প্রভাব ফেলে। তবে একজন লেখক যখন প্রথম পুরুষে কথা বলেন–আমি আমি করে, তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানে এই না উনি নিজের কথাই বলছেন। উনি আসলে অন্য ভয়েসেই কথা বলছেন। অনেক সময় কবিরাও অন্য মুখোশ ব্যবহার করে, বিভিন্ন মানুষের মুখোশ ব্যবহার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখক যখন কোনো ঘটনা, কোনো চিত্র বা কোনো ভাবনা দ্বারা আলোড়িত হন, তখনো তো তিনি সেটা নিয়ে লিখতে প্রবৃত্ত হন। সে অর্থে সব লেখার মধ্যেই কবির ব্যক্তি সত্তার একটা ছায়া পড়ে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : জীবন পদ্ধতির কোনো ছাপ পড়ে লেখকের লেখার পরিমাণে, গুণে ?

শহীদ কাদরী জীবন পদ্ধতির ছাপ পড়তে পারে। বিশেষত জীবন পদ্ধতি যদি বিশৃঙ্খল হয়। এর উল্টো দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু জীবন পদ্ধতির বিশৃঙ্খলার জন্য লেখায় বিশৃঙ্খলা আসতে পারে। জীবন পদ্ধতি বিশৃঙ্খল হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে জীবনের কোনো বিশেষ সময়ে যে ধরনের মনোনিবেশ দরকার, সেটা না থাকলে, অস্থিরতা থাকলে লেখার যে শৈল্পিক শৈলী সেখানে ছাপ পড়তে পারে। এটা বাংলাদেশের অনেক কবিদের মধ্যেও দেখা গেছে। কিন্তু আবার বদলেয়ার-এর কাব্যশৈলীতে তাঁর জীবনাচরণের কোনো ছাপই নেই। তিনি পাগলের মতো মাথা কামিয়ে সবুজ রঙ মেখে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। ছেলেপিলেরা ইট মারত। টাকার অভাব ছিল। তাঁর সৎবাবার কাছ থেকে তার প্রাপ্য টাকা সবসময় পেতেন না। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলো ফরাসি ধ্রুপদী কাব্যশৈলীর নিখুঁত দৃষ্টান্ত। মাইকেল মধুসূদনেরও তো অত্যন্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাপন তারপরও তাঁর লেখা খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধ। আবার নজরুলের লেখায় কিন্তু তাঁর বিশৃঙ্খল জীবনের ছাপ পড়েছে। তাঁর রচনাশৈলীতে সেই ছাপ বিদ্যমান। নজরুল একটা কথা বলতেন মাঝে মাঝে,"গুরুদেব আমাকে বলতেন,'ওরে উন্মাদ, তোর জীবনে শেলি, কীটসের মতো একটা বড় ট্রাজেডি আছে'।"

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : বিত্ত আর বিত্তের অভাবও সম্ভবত কবিকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। রবীন্দ্রনাথ বিত্তের মধ্যেই বড় হয়েছেন। অপরদিকে দেখা যায় আমাদের জীবনানন্দ দাশ খুব একটা বিত্তবান ছিলেন না।

শহীদ কাদরী : ভীষণ অর্থকষ্ট ছিল তার।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দারিদ্র্যকে সর্বদাই ...

শহীদ কাদরী : তবে শেষের দিকে দারিদ্রতা তাঁর শৈলীকে আক্রান্ত করেছিল। অবশ্য মদ্যপানও একটা কারণ ছিল।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : কবির ব্যক্তিগত জীবন তাঁর শৈলীকে আক্রান্ত করে না যে তা নয়, কিছুটা বোধহয় করেই।

শহীদ কাদরী : তা তো করবেই, এ ছাড়া তো উপায় নেই। তবে আমি বললাম যে লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার ছাপ থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাঁর পক্ষে সম্ভব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়–কীটস যে ক্ষমতাকে বলেছেন নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় অন্য কণ্ঠস্বরে বলার। যেমন, একটা মেয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখার। রবীন্দ্রনাথের 'বেলা হলো মরি লাজে'–এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ না। যেহেতু ভারতীয় কনসেপ্টেও এটা আছে শিল্পীরা, কবিরা অর্ধনারীশ্বর। আমি এই প্রসঙ্গে থিওডর রোয়েটকের কবিতার কথা উল্লেখ করতে চাই। থিওডর রোয়েটকের কবিতা আবহমান, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা মিলিয়ে ইউনিক কবিতা। থিওডর রোয়েটকের বাবার গ্রিন হাউসের ব্যবসা ছিল। থিওডর রোয়েটকের কবিতায় দেখা যায় একটা জন্ম থেকে, উন্মেষ থেকে তার অভ্যুত্থান পর্যন্ত একটা প্লান্ট যেমন ফিল করে, হি ফেল্ট লাইক দ্যাট। তাঁর কবিতাগুলো ওই রকমের, মনে হয়, একটা প্লান্ট জন্ম নিচ্ছে। এরকম সেনস্যুয়াল, এরকম টেক্সচার। হি ওয়াজ অ্যাবল টু এনটার ইনটু দ্য ট্রি–কবিদের এই ক্ষমতাও তো আছে। কবিরা যখন একজন নিরন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবিতা লেখেন, তখন তিনি নিজে নিরন্ন না হয়েও নিরন্ন মানুষের বেদনা ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। এই ক্ষমতা তো আছেই কবিদের। কবিদের আছে, গল্পকারদের আছে, ঔপন্যাসিকদের আছে। নয়তো ঔপন্যাসিক এত বিভিন্ন চরিত্র কীভাবে সৃষ্টি করেন!

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : আমরা শুরুতে ফিরে যাচ্ছি আবার, তোমার কবিতার কথায় ফিরে আসি। তুমি তোমার কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠককে কী দিতে চেয়েছ ? বা পাঠকের মধ্যে কোন আবেগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছ ? পাঠককে কী বলতে চেয়েছ ?

শহীদ কাদরী : আমি প্রথমত *উত্তরাধিকার* কবিতার মাধ্যমে... আমার প্রথম বইয়ের নামও *উত্তরাধিকার*...পাঠকদের বলতে চেয়েছি যে আবহমান বাংলা কবিতা এবং তিরিশের কবিতার প্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান কোথায়। আমরা যখন জন্মগ্রহণ করলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে পড়ল। সর্বত্রই ব্ল্যাকআউটের শহর। জাপানি বোমা পড়বে–এই ভয়। এমন সময়ে আমরা জন্মালাম। আরেকটু বড় হতেই আমরা দেখলাম আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ। দেশভাগ হতে না হতেই আমাদের অনেককে যেটা আজন্ম নিজেদের দেশ বলে জেনেছি সে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। এই যে পটভূমি, এই পটভূমির কারণে আমাদের মানসিকতা তিরিশের কবিদের মানসিকতা থেকে অনেকটা ভিন্ন। তিরিশের কবিরা নরকের কথা বলেছেন, নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন। মানুষ মাত্রই নিঃসঙ্গ, কিন্তু নিঃসঙ্গতারও মাত্রা আছে। তিরিশের কবিরা যে নরকের কথা বলেছেন, যেমন সুধীন দত্তর কবিতায়, সে নরক তারা তাত্ত্বিকভাবে দেখেছেন। কিন্তু আমরা সেই নরকেই বড় হলাম। এবং সেই নরকে বড় হওয়ার পর, সেই নরকে বসবাস করার যে অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটা কবিতার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। সাধারণ পাঠকরা যখন কবিতাটা সম্পর্কে বলে তখন খুব ভুল ব্যাখ্যা করে। কবিতাটা হলো 'বৃষ্টি! বৃষ্টি!' সবাই মনে করে এটা নাগরিক বৃষ্টি। নাগরিক বৃষ্টি ওটা না। ওটায় দেখানো হয়েছে শহরটা ধ্বংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাচ্ছে। এমন বৃষ্টি যে শহরটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাবার পর নগরে রাজত্ব হচ্ছে কাদের ? যারা আজীবন ভিক্ষুক, যারা আজীবন নগ্ন, যারা আজীবন ক্ষুধার্ত। আর যারা রাজস্ব আদায় করে তারা সব পালিয়েছে। এই যে একটা প্রচণ্ড শক্তি তা এই নগরকে, যে নগরকে আমরা ধ্যানজ্ঞান মনে করছি, সে নগরকে একটা বিরাট শক্তি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই শক্তিকে আমি আঙুল দিয়ে শনাক্ত করি নি। এটা রাজনৈতিক শক্তি হতে পারে, এটা গণজাগরণ হতে পারে, বৈপ্লবিক উত্থান হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে আনন্দিত হচ্ছে কারা, নগরের দখল করছে কারা ? আজীবন ভিক্ষুক, আজীবন নগ্ন, আজীবন ক্ষুধার্তেরা। এই শহরে বসবাস করার অনুভূতিগুলো সংক্রামিত করার চেষ্টা করেছি। কখনও পেরেছি, কখনো পারি নি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এ প্রশ্নটি নিশ্চয়ই তোমাকে আগেও অনেকবার করা হয়েছে। তবু আবার প্রশ্ন করতেই হচ্ছে। সব লেখকই চান পাঠকপ্রিয় হতে। কিন্তু এমন কোনো পর্যায় থাকে, যে পর্যায়ে এসে মনে হয় যে পাঠকপ্রিয়তা নয়, আমি আমার জন্যই লিখব, আমার মতো করেই লিখব, পাঠক এটা নিক বা না নিক।

শহীদ কাদরী আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রথমদিকে আমি পাঠকপ্রিয়তার কথা চিন্তাই করি নি, কিন্তু মধ্যপথে এসে আমার একবার মনে হয়েছিল যে কিছু কবিতা লেখা সম্ভব যা একটু পপুলার, সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর বক্তব্যও লুকিয়ে থাকবে কিন্তু বলাটা হবে হালকা চালে যাতে সেটা সহজ হবে পাঠকের জন্য। এভাবে আমি কয়েকটা কবিতা লিখেছি। যেমন আমি ইমিডিয়েটলি একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি–'রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট'। এখানে বক্তব্যটা হচ্ছে সব ইভিলের উৎস হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট– অরিজিন অব অল ইভিলস। আমি ইচ্ছে করলে 'স্টেট অ্যান্ড রেভ্যুলেশন' থেকে কোট করতে পারতাম লেখাটাকে একটা ভারিক্কী চাল দেওয়ার জন্য। ভাবলাম, এভাবেই লিখে দেখি লোকজন কীভাবে নেয়। এটা একসময় লোকে পছন্দ করেছে। আমি এ ধরনের কিছু হালকা চালের কবিতা লিখেছি। আমি দেখেছি অনেকেই এভাবে মাঝে মধ্যে লিখেছেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'কবিমশাই, আপনি নিজে দেখেছেন তো প্রেমে পড়ে/ বলুন না সে কেমন তবে/ লোকে যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়/ সেখানেই কি প্রেমের আগুন'। মাঝে মাঝে হালকা চালের আড়ালে পাঠকপ্রিয় হওয়ার কি একটা বাসনা থাকে না ?

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সর্বদাই থাকে। আমার নিজের কথাই যদি বলা যায়, আমি আমার লেখক জীবনে দু'ধরনের লেখা লিখেছি। একটি পাঠকপ্রিয় না হলেও মোটামুটি সহজবোধ্য, প্রচলিত ধারার গল্প, অন্য ধরনটি ছিল..

শহীদ কাদরী : অপ্রচলিত ধারায়–

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : হ্যাঁ, অনেক কাল অবধি আমি এরকম লিখেছি। পরবর্তী কালে বিরতির পরে আমি চেষ্টা করেছি মোটামুটি ব্লেন্ড করে লেখার। সেখানেও এক ধরনের পাঠকপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা তো আছেই বলা যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী হ্যাঁ। আচ্ছা, আমার মনে হয় এখানেই থেমে যাই। যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু।

মাজহারুল ইসলাম : হ্যাঁ, তবে প্রবাস জীবনের বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত হ্যাঁ, ভালো প্রশ্নটি বাদ গেছে। আমাদের উভয়েরই জন্য খুবই জরুরি প্রশ্নটি বাদ গেছে। এই যে পরবাস, একজন লেখকের নিজ দেশ যেখানে সে বড় হয়েছে, বেড়ে উঠেছে তার বাইরে এসে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে থাকায় তার লেখায় প্রচুর পরিমাণে এফেক্ট পড়ে।

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ, তা করে। প্রবাসে বাস করি, কবিতায় নিশ্চয়ই তার প্রভাব পড়ে। লোকে অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টান্ত দেয়। তবে অমিয় চক্রবর্তী প্রবাসে আসার আগেই বাংলাভাষার একজন প্রধান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'একমুঠো খসড়া', 'দূরযানী' এসব লেখা হয়ে গেছে তাঁর। প্রবাসে উনি 'পরপার' আর 'পালাবদল' প্রধানত এ দু'টি বই লিখেছেন। তবে আমি মনে করি দেশে থাকলে যেসব ঘটনা ঘটে, যেসব আলাপ-আলোচনা হয়, এগুলো নানাভাবে লেখককে উদ্বুদ্ধ করে, চালিত করে। কখনও সে প্রতিবাদী হয়, কখনো সমর্থন করে। এমনকি বিদেশে এসেও দেশের একেকটা ঘটনার তরঙ্গ এসে তাকে আঘাত করে কিন্তু সে আঘাত এত সরাসরি নয়। তার জন্যে অবশ্যই লেখা ব্যাহত হয়। প্রবাসে আরেকটা মস্ত অসুবিধা এই যে, প্রবাসে লেখকেরা সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপরে নির্ভর করেন। কিন্তু স্মৃতিটা তো স্মৃতিই হয়ে গেছে, সেটা তো আজকের সময় না। মাঝে মধ্যে বছরে একবার দেশে গেলেও দেশের মধ্যে যে সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার স্রোত, প্রতিস্রোত, জোড়াস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে– এগুলো সব স্পর্শ করা যায় না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : ফেলে আসা জীবন নিয়ে যদি লেখককে থাকতে হয় তাহলে তো একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কী পরিমাণে তার রচনা ব্যাহত হয়।

শহীদ কাদরী অ্যাকজাক্টলি। তবে প্রবাসে লেখক প্রবাসের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশ নিয়েও লিখতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন। ইউরোপের অনেক লেখকই নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গেছেন কিন্তু তারা ইউরোপিয়ান ফ্রেমের মধ্যেই থেকেছেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : অনেকে বিদেশে বসেও যা লিখেছেন...যেমন, সিংগার–

শহীদ কাদরী হ্যাঁ, তবে ওই পোলান্ডেই তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড। কিছু সস্তা বই আছে নিউইয়র্কের ব্যাকগ্রাউন্ডে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আরেকটি মজার ব্যাপার কিন্তু আছে। যারা ছোটবেলা থেকেই বিদেশে আছে, বিদেশেই লেখক হিসেবে যারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাদের লেখার বিষয়ও কিন্তু দেশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ, ঝুম্পা লাহিড়ীও তাই, অরুন্ধতী রায়ও তাই।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : মনিকা আলী যে 'ব্রিক লেন' লিখেছেন লন্ডনের পটভূমিকায় কিন্তু লিখেছেন তো বাঙালিদের নিয়ে। লেখককে বোধহয় কোনোভাবেই নিজ দেশ থেকে আলাদা করা যায় না।

শহীদ কাদরী : 'যদি নির্বাসন দাও বিষ ছোঁয়াব ওষ্ঠাধরে'। নির্বাসন চিরকালই তো দণ্ড।

মাজহারুল ইসলাম আপনার দেশের বাইরে চলে আসার প্রেক্ষাপটটা তো নতুন জেনারেশন জানতে চাইবে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : নিশ্চয়ই চাইবে।

শহীদ কাদরী : দেশ ছেড়ে আসার কোনো প্রেক্ষাপট ছিল না। দেশ ছেড়ে আসব ঠিক করি নি। ঠিক করেছি দেশে ফিরে যাব। আমি অসুস্থ না হলে এখনই ফিরে যেতাম। আমার স্ত্রীও তো থাকতে চায় না এখানে। অনেকে বলে তোমার কপাল ভালো যে তুমি বিদেশে। কারণ বাংলাদেশে চিকিৎসার যে খরচ তা কোটিপতি হলেও বহন করা সম্ভব হতো না। আমার আজকে দশ বছর চলছে ডায়ালাইসিস।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : আমার নিজের যেমন বিদেশে আসা হয়েছিল লেখাপড়া করতে। লেখাপড়া করতে এসেছিলাম, সম্পূর্ণ ফিরে যাবার বাসনা নিয়ে। ফিরে যাবার সবই প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তখন যুদ্ধ লেগে গেল। আর ফিরে যাওয়া হল না। আবার লেখাপড়া শুরু করলাম। পিএইচডি ডিগ্রি যখন শেষ হলো, সেই '৮০ থেকেই আমার চেষ্টা ছিল দেশে ফিরে যাবার জন্য।

মাজহারুল ইসলাম : আপনি দেশ থেকে এসেছেন কোন বছরে ?

শহীদ কাদরী : '৭৮-এ এসেছি।

মাজহারুল ইসলাম : তারপর থেকে তো..

শহীদ কাদরী : না, '৮২ তে ঢাকায় গিয়েছিলাম।

মাজহারুল ইসলাম : তারপর আর যাওয়া হয় নি ?

শহীদ কাদরী : না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : শহীদ–

শহীদ কাদরী : হ্যাঁ।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তোমায় যন্ত্রণা থেকে এবার মুক্তি দেওয়া যাক। আমরা চলি। ০

(অন্যদিন ঈদসংখ্যা ২০১২ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহীদ কাদরীর
বাছাই কবিতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি, বৃষ্টি

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে
যারা ছিলো তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আর্‌শোলার মতো যেনবা মড়কে
শহর উজাড় হবে, বলে গেল কেউ–শহরের
পরিচিত ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে খুব ঠাণ্ডা এক ভয়াল গলায়

এবং হঠাৎ
সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে
বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম!
বজ্র-শিলাসহ বৃষ্টি, বৃষ্টি : শ্রুতিকে বধির ক'রে
গর্জে ওঠে যেন অবিরল করাত-কলের চাকা,
লক্ষ লেদ-মেশিনের আর্ত অফুরন্ত আবর্তন!

নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ
মেঘ, জল, হাওয়া,–
হাওয়া, ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চিৎকার,
কী বিপদগ্রস্ত ঘর-দোর,
ডানা মেলে দিতে চায় জানালা-কপাট
নড়ে ওঠে টিরোনসিরসের মতন যেন প্রাচীন এ-বাড়ি!
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় জনারণ্য, শহরের জানু
আর চকচকে ঝলমলে বেসামাল এভিনিউ

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)
বৃষ্টি পড়ে মোটরের বনেটে টেরচা,
ভেতরে নিস্তব্ধ যাত্রী, মাথা নিচু
ত্রাস আর উৎকণ্ঠায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে, –জল,
অবিরল

জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল,
আর ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় শোনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্রন্দন, ক্রন্দন
নিজস্ব হৃৎপিণ্ডে আর অদ্ভুত উড়োনচণ্ডী এই
বর্ষার ঊষর বন্দনায়

রাজত্ব, রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে–পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মুক্ত, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ। রাজস্ব আদায় করে যারা,
চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়
পালিয়েছে ভয়ে।

বন্দনা ধরেছে,–গান গাইছে সহর্ষে
উৎফুল- আঁধার প্রেক্ষাগৃহ আর দেয়ালের মাতাল প্ল্যাকার্ড,
বাঁকা-চোরা টেলিফোন-পোল, দোল খাচ্ছে ওই উঁচু
শিখরে আসীন, উড়ে-আসা বুড়োসুড়ো পুরোন সাইনবোর্ড
তাল দিচ্ছে শহরের বেশুমার খড়খড়ি
কেননা সিপাই, সান্ত্রী আর রাজস্ব আদায়কারী ছিলো যারা,
পালিয়েছে ভয়ে।

পালিয়েছে, মহাজ্ঞানী, মহাজন, মোসাহেবসহ
অন্তর্হিত,
বৃষ্টির বিপুল জলে ভ্রমণ-পথের চিহ্ন
ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে
কেবল করুণ ক'টা
বিমর্ষ স্মৃতির ভার নিয়ে সহর্ষে সদলবলে
বয়ে চলে জল পৌরসমিতির মিছিলের মতো
নর্দমার ফোয়ারার দিকে,–

ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো বেজে সিগারেট–টিন
ভাঙা কাঁচ, সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন
মসৃণ সিল্কের স্কার্ফ, ছেঁড়া তার, খাম, নীল চিঠি
লন্ড্রির হলুদ বিল, প্রেসক্রিপসন, শাদা বাক্সে ওষুধের
সৌখীন শার্টের ছিন্ন বোতাম ইত্যাদি সভ্যতার
ভবিত্যহীন নানাস্মৃতি আর রঙবেরঙের দিনগুলি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকার মতো একমাত্র আমি,
আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তেমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলে আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নপুংসক সন্তের উক্তি

শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্রবিন্দুর স্বাদে
রুচি নাই, ততটাই বিমুখ আমরা বন্ধুদের
উজ্জ্বল সাফল্যে অলৌকিক। কে গেল প্রাসাদে আর
সেই নীল গলির গোলকধাঁধা কার চোখে, ঈর্ষায় কাতর

কেবা (হয়তো-বা আমরাও)। দ্রুত তিমিরে তলাবে
গদ্যের বদলে যারা সুললিত পদ্যে সমর্পিত–
টেরী কাটা মসৃণ চুলের কবি, পাজামা-পাঞ্জাবি
হাওয়ায় উড়িয়ে হাঁটে তারা আজীবন নিশ্চিন্তে নরক-ধামে,

এবং চৈতন্যে নেই অবিরাম অনিশ্চিত, অশেষ পতন
পলে-পলে স্খলনের অঙ্গীকার আর অনুর্বর মহিলার
উদরের মতো আর্ত উৎকণ্ঠিত, আবর্তিত শূন্যতার ভার,
নেই এই ভিড়াক্রান্ত, বিব্রত, বর্বর ঊর্ধ্বশ্বাস শহরের

তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার!
পূর্ণিমা-প্রেতার্ত তারা নির্বীজ চাঁদের নিচে, গোলাপ বাগানে
ফাল্গুনের বালখিল্য চপল আঙুলে, রুগ্নঊরু প্রেমিকার
নিঃস্বপ্ন চোখের 'পরে নিজের ধোঁয়াটে চোখ রাখে না ভুলেও,

কল্পমান অবিবেকী হাতে খুঁজে দেয় ম্লান ফুল
পীতাভকুন্তলে তার, প্রথামতো সেরে নেয় কবির ভূমিকা,
ইতিহাসের আবহে নাকি আজ এ সকলই ঐতিহ্যসম্মত,–
এই নির্বোধ আনন্দ-গান, ওই অনাত্ম উৎসব!

আমরাই বিকৃত তবে ? শান্ত, শুদ্ধ এই পরিবেশে
আতর লোবান আর আগরবাতির অতিমর্ত্য গন্ধময়
দেবতার স্পর্শ-পাওয়া পবিত্র গ্রন্থের উচ্চারণে
প্রতিধ্বনিময় সবজিক্ষেতের উদার পরিবেশে

সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় কেন তবে কষ্টশ্বাস ?
কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন

সদ্য উঠে-আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ!
আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা ? সবার আত্মার পাপ
আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার মতো লেগে আছে ?
জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলি শেষ বংশজাত আমি,

বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ, কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান!
আমাকে এড়ায় লোকে, জাতিস্মর অবচেতনার পরিভাষা
যেহেতু নিয়েছি আজ নিষ্করুণ আর্তস্বরে সাহসীর মতো,
তাই অগ্রজের আয়োজন শুরু হয় বধ্যভূমির চৌদিকে

আমাকে বলির পশু জেনে নিয়ে, উজ্জ্বল আতসবাজি আর
বিচিত্র আলোক সাজে ঢেকে দিয়ে রাত্রির আকাশ
দেখায় আবার ভেল্কি কাড়া-নাকাড়ায় সাড়া তুলে
যূথচারী মানুষেরে! এবং আমার শরীরের সবজিক্ষেতে
অসীম উৎসাহভরে একটি কবর খুঁড়ে রাখে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নশ্বর জ্যোৎস্নায়

জ্যোৎস্নায় বিব্রত বাগানের ফুলগুলি, অফুরন্ত
হাওয়ার আশ্চর্য আবিষ্কার করে নিয়ে
চোখের বিষাদ আমি বদলে নি' আর হতাশারে
নিঃশব্দে বিছিয়ে রাখি বকুলতলায়
সেখানে একাকী রাত্রে, বারান্দার পাশে
সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে,

টলটল করবে কেবল এই নক্ষত্রের আলো-জ্বলা জল
অপ্সরার ওষ্ঠ থেকে খসে-পড়া চুম্বনের মতো
তৃষ্ণা নেভানোর প্রতিশ্রুতিতে সজল
এই আটপৌরে পুকুরেই
শামুকে সাজাবে তার আজীবন প্রতীক্ষিত পাড়।

আমার নির্বেদ কোনো বালকের ব্যগ্র আঙুলের মতো
আদর জানাবে শাদা, উষ্ণ রাজহাঁসের পালকে,
অবিশ্বাস, মখমলের কালো নক্ষত্রগুখচিত চুপি প'রে
সশব্দে দরোজা খুলে এক-গাল হাওয়া খেয়ে বেড়াবে বাগানে

পরিত্যক্ত মূল্যবোধ, নতুন ফুলের কৌটোগলো
জ্বলজ্বলে মণির মতন সংখ্যাহীন জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে
নিঃশব্দে থাকবে ফুটে মধ্য-বিশ শতকের ক্লান্ত শিল্পের দিকে চেয়ে
–এইমতো নির্বোধ বিশ্বাস নিয়ে আমি
বসে আছি আজ রাত্রে বারান্দার হাতল-চেয়ারে
জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেমিকের গান

ধনুকের মতো টংকার দিল টাকা
তোমার উষ্ণ, লাল কিংখাবে ঢাকা
উজ্জ্বল মুখ যেনবা পয়সা সোনালি রুপালি তামা

পরপর দেখি বেজে চলে যায় নিত্য
পরিবর্তিত তোমার মুখের সারি
দেখেও দেখি না চিনি তবু বিদেশিনী

প্লাটিনাম সে কি দস্তা কিংবা তামা
নাকি সে নকল তারা
মঞ্চের কালো পর্দার পর রুপার চুমকি তুমি

মনে হয় যেন বার্মা টিকের নিপুণ পালিশ
সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব
গিলে খাবে বুঝি পৃথিবীর সব

সোনালি, রুপালি শাড়ি
ওগো কী সূক্ষ্ম তোমার চিকন ক্ষুধা
স্যাটিন কিংবা শীফন ব্যতীত সোনামুখ যেন তামা

ভয়াল, হিংস্র তোমার মুখের সারি
লৌহ কঠিন বিশাল উদর খোলা যেন সিন্দুক
ভরে দেবো সোনাদানা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকার

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে–
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু, রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউটে আঁধারে।

কাঁটা-তারে ঘেরা পার্ক, তাঁবু, কুচকাওয়াজ সারিবদ্ধ
সৈনিকের। হিরন্ময় রৌদ্রে শুধু জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান,
ভোরবেলা সচকিত পদশব্দে ঝোড়ো বিউগলে
গাছ-পালা, ঘরবাড়ি হঠাৎ বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে।

শৃংখলিত, বিদেশির পতাকার নিচে আমরা শীতে জড়োসড়
নিঃশব্দে দেখেছি প্রেমিকের দীপ্ত মুখ থেকে জ্যোতি ঝরে গেছে
ম্লানমুখো ফিরেছে বালক সমকামী নাবিকের
মরিয়া উল্লাসে ধ্বনি আর অশ্লীল গানের কলি

নীর পালকের মতো কানে গুঁজে, একা সাঁঝবেলা।
যীশুখৃষ্টের মতন মুখে সৌম্য বুড়ো সয়ে গেছে
ল্যান্টর্নের ম্লান রাত্রে সৈনিকের সিগারেট, রুটি, উপহার
এবং সঙ্গম-পিষ্ট সপ্তদশী অসতর্ক চিৎকার কন্যার।

রক্তপাতে, আর্তনাদে, হঠাৎ হত্যায় চঞ্চল কৈশোর-কাল
শেখালে মারণ-মন্ত্র-আমার প্রথম পাঠ কী করে যে ভুলি,
গোলাপ-বাগান জুড়ে রক্তে-মাংসে পচেছিলো একটি রাঙা বৌ
ক'খানা ছকের ঘুঁটি মানুষের কথামতো মেতেছিলো বলে।

ছদ্মবেশী সব মুখ উৎসবে লেগেছে ফের, ফেনিল উৎসবে,
কী শান্ত নরম গলা, সন্ধ্যা হাওয়ায় বসে আছে
দু'দিন আগের মুখ, ভালোবাসা-স্তব্ধ-করা আততায়ী-মুখ
সন্তর্পণে নিয়েছে গুটিয়ে যেন আস্তিনের সাথে,

যেন কেউ কামমত্ত ভালুকের মতো করে নাই ধাওয়া কোনো
মহিলারে পাতালে নাবানো ঠাণ্ডা কূপের গহ্বরে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সূর্যাস্তে নির্ভার মনে যেন শোনে নি বোমারু শিস্
হঠাৎ কৃষক, দূরে দাউদাউ অন্তিম আগুন তার পড়শির গ্রামে,

লুটিয়ে পড়ে নি কেউ স্বদেশী পার্কের ছবি হাতে
বিদেশির গমক্ষেতে বাসিমুখে কফির বাটিতে মুখ রেখে!
বালকের মুঠো থেকে খসে গেছে হালকা সূক্ষ্ম সুতো বেলুনের
অচেনা দুর্বোধ্য ত্রাসে, আমার চোখের নিচে, এভেন্যুর ধারে,

নির্বোধের আলস্যে কেবল ম্লান হাস্যে জানিয়েছি
মনোরম অস্তরাগে শুধু আমার গোধূলি-ভাষ্য
মূল্যবোধের আর যা কিছু সত্য তাই হতাশার
পরম, বিশ্বস্ত অনুগামী, প্ররোচক বুঝি স্বেচ্ছামরণের,

–এইমতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
এবং আমাকে নিষ্কপর্দক, নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
ক'রে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা!
আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো

বিপদ-সংকেত জ্বেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো
অনিদ্রায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাশের কামরার প্রেমিক

গলা চিরে থুথু ফ্যালে দাপায় কপাট নড়বড়ে
শ্বাসকষ্টে যা পায় তা' প্রেম, ঠাণ্ডা হাওয়া
হৃৎপিণ্ডে বিরক্তিকর উৎকট নর্তন
অলৌকিক ইচ্ছা তার তাকে দিয়ে টেবিল বাজায়

মাঝরাতে নিঃসঙ্গতা রাঙিয়ে টেবিলে
একজোড়া লালচোখ, একটি লণ্ঠন
বিশ শতকের সুন্দর সুগোল এক পেটের ভেতরে যেন
দেখে নেয় প্রাক্তন প্রেমিকদের বিধ্বস্ত কবর

চোখের সামনে রাতভর নীলরজ্জু এক মুকুতা দোলায়
আর যেন তারার চুম্‌কি-জ্বালা সেই অন্তর্বাস
যথার্থই সৎচেষ্টায় খুলে দিয়ে আকাশ দেখায়
খেলোয়াড়ের মতন একে-একে শূন্যতার সবগুলো ভাঁজ

তার সামনে সর্পের বঙ্কিম, শান্ত চতুরালি, স্পষ্টত নিষ্পাপ
ফোলা-গাল সাপুড়ের ভেঁপু একেবারে নির্ভয়, বিপদমুক্ত,
হস্তের অব্যর্থ ফাঁদে দেয় গলা বাড়িয়ে প্রেমিকা
ঝাঁপিতে আটকে রেখে বাতি-না-জ্বেলেই শোয়া যায়

এ হেন অনেক কিছু, একটু আয়াসে চীনে বাদামের খোসা
ভাঙতে-ভাঙতে পার হওয়া যায় হে দীপ্ত প্রেমিক, বন্ধু, ভাই
যথা শান্ত দুপুরে দেলাক্রোয়ার ক্রুদ্ধ, রুদ্ধ মত্ত অশ্বারোহী
ট্রেনে-কাটা শূকরের লালরক্ত, মৃত্যু, আর্তনাদ !

কিছুই শোনে না কেউ তলপেটে অনাস্বাদিত বিহ্বল কাম
আত্মার ভেতরে ওড়ে নীলমাছি বিরক্তির মগজে উদ্যান।
দীর্ঘজীবী হোক তবু যেন তার সব স্বপ্নক্রীড়া
মাঝরাতে যে কারণে হিমহস্ত টেবিল বাজায়!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতাই আরাধ্য জানি

কবিতাই আরাধ্য আমার, মানি; এবং বিব্রত
তার জন্য কিছু কম নই। উপরন্তু আছি পড়ে উপাধিবিহীন, জানি
বাণিজ্যে বসতি যার সেই মা' লক্ষ্মীর সংসারেই উন্মূল, উদ্বৃত্ত, তবু
কোনোমতে টিকে-থাকা, যেন বেঢপ ভূমিকাশূন্য তানপুরা!

উপরন্তু গ্রাম্যজনে যেই গান চায় কিংবা গায়, ইদানীং ওহে
তা' কেউ জানে না আর, জানার উপায় নেই বলে ?
কেননা যে আছে
হাত-পা ছড়িয়ে বেণুবনে রুক্ষচুলে, শুকনো মুখে
ফেলে সে দিয়েছে
আনমনে, সোনালি, নিটোল, বাঁশিখানি, কোলের ওপরে হাত
ভারী হয়ে পড়ে আছে, মরা, একেবারে মরে-যাওয়া ম্লান খরগোশ।
কিন্তু সতেজ পাতার মতো তার কান, কর্ণকুহরে কুহক, ঘণ্টাধ্বনি
দূর শহরের,
তাই আর খোঁজে না সে কাঁটাবনে, হৃৎপিণ্ডের ত্রস্ত-স্বপ্নে দ্রুত
কী করে ঝরে গেল, পড়ে গেল, নড়ে গেল হাত, হাতের বাঁশরী
–গেঁয়োমুখে নাবালক ভয় শুধু, উদ্বিগ্ন বিস্ময় আর এক
অসম্ভব দাবি,
বোঝে না সে জীর্ণ কাঁথার মতন পচে যায় গ্রাম্যগাথা সব
ম্লান সবজিক্ষেতে।
ফেরার উপায় নেই; সহযাত্রীর হৃদয়ে নেই আর রাস্তার সংকেত,
পুরোনো লণ্ঠন,
পিতামহের হা-খোলা, মৃত, হলুদ চোখের মতো দ্যুতিহীন,
দেখায় না পথ।
ধ্বংসের বিপুল গুণে দেখা যায় মসজিদের বিদীর্ণ ধাপ
নেবে গেছে খাদে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিরুদ্দেশ যাত্রা

অলৌকিক অদ্ভুত দ্রব্যাদি সব খেয়ে-দেয়ে বাঁচি
সুহৃদের তিরস্কার বাতাসের সাথে সাথে এসে
লুটোয় টেবিলে, উল্টে দেয় সাধের গেলাস আর
নীল বাক্সো ম্যাচিসের ময়ূরের বর্ণালী পালক–

শব্দহীন ঝ'রে পড়ে দূর বাল্যকালে কেনা, ওই
লাবণ্যের নিঃসঙ্গ পুতুল আর সবুজ রঙের
টুপি থেকে; অগ্রজের তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায় বজ্র যেন
জানালায় যমদূতের মতন ত্রাস নেচে নেচে

কেবলই দেখিয়ে যায়, গহ্বর, কবর আর ম্লান
পাণ্ডুর রোগের রাত স্বপ্নহীন শীতার্ত শয্যায়;
প্রিয়তম মহিলার উদ্বিগ্ন, করুণ, রাগী স্বর,–
নাকের মুখে নম্র নখের আঁচড়,–বৃষ্টির ঝাপট,–

প্রতিবাদমুখর চিৎকারে যেন তারা নেভায় প্রদীপগুলো
স্বর্গের গোপন ধাপে-ধাপে আমি যা রেখেছি যত্নে,
একদা চয়ন করে সভ্যতার মৃত অন্ত্র ছেনে,
কোনোমতে শুঁকে-শুঁকে, ভয়ে, সরল জিহ্বায় চেখে

ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, ক্ষুধামত্ত জন্তু যেন একরোখা!
দেখেছি প্রখ্যাত ক্ষেত,–নষ্টফল,–নক্ষত্রের মতো
দ্রাক্ষা, ইক্ষু, গম, সর্ষে আর জ্যোৎস্না আর ফাঁকা তাঁবু,
ঈশ্বরের উজ্জ্বল নীলিমা,–সন্ধিৎসু সন্তের মনে

সুন্দর সূর্যাস্ত থেকে ভোরবেলাকার সূর্যোদয়
পর্যন্ত হেঁটেছি। আর অসীম অধৈর্যভরে ঘেঁটে,
সেই চঞ্চল, পিচ্ছিল জরায়নে সভয়ে দেখেছি
শয়তানের ধমল মুখ : শূন্যতার বস্ত্রে মোড়া

জরা, মৃত্যু, আর্তির চন্দন-ফোঁটা তার অবয়বে,
প্রশান্ত করেছে তাকে সন্ধ্যার মতোই আগাগোড়া,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আততায়ী,–লুকিয়ে রয়েছে প্রেমিকার অনুনয়ে,
অনুজের মূল্যবোধে, আমাদের উদ্বাস্তু দশকে

প্রগতির অন্বেষায় আর প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ
পিছুটানে, যত্রতত্র সমৃদ্ধির সকল খবরে,
সংবাদপত্রে ও মানুষের অন্তিম গন্তব্যে, আর
ক্রুদ্ধ সম্পাদকীয় মন্তব্যে!
ফলত নিঃশব্দে নেমে পড়ি
কবিতার শুঁড়িলোকে, মদ্যপের কণ্ঠনালি বেয়ে
মিশে যাই পাকস্থলীর, প্লীহার অম্ল রসায়নে ॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরস্পরের দিকে

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি
আমরা, এই অন্ধকারে।

প্যাঁচার তীব্র চিৎকার
যেন এই রাত্রির শরীরের ওপর,
নিরন্তর আঁচড় রেখে যাচ্ছে।

কোন সংগোপন উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে
অনর্গল ছেঁড়া-খোঁড়া দৃশ্যগুলো :
একটা মদির অশ্ব বারবার লাফিয়ে উঠছে
বাতাসে শূন্যতায়,–
বাগানে ঝুলন্ত চাঁদ জবার মতো লাল

তোমার ক্লেদ সহসা ইন্দ্রধনু হলো।
আর আমি কাঁকড়ার মতো
অনুর্বর উল্লাসে ভোজে মত্ত, একের পর এক
শুধু ক্ষত তৈরি করলাম।

হঠাৎ ক্ষতগুলো
মাতালের প্রোজ্জ্বল চোখের মতো,
মগ্ন, উৎসুক মুখ
আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

বাহুর বিন্যাসে নিবিড় হলো সান্নিধ্য আমাদের।
শুধু এইসব দৃশ্যের অকারণ, অদ্ভুত
অনুভূতিগুলো ডুবিয়ে
তোমার কান্না আমাকে ছুঁতে পারল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিপরীত বিহার

বলিহারি যাই তোর অদ্ভুত বররুচি
ভিখিরিও ছোঁবে না যা নোংরা আঙুলে
তাই শেষে তুলে নিলি অমন সুন্দর চঞ্চুপুটে

চঞ্চল স্বভাব তোর, কিন্তু তবু কানা করল কে ?
ক্ষুধা ? আমি তো রেখেছি যত্নে, উষ্ণ নরম শাদা রুটি
পচা মাংসেই ঘটালি তো রসনার অশুচি!

আমি কি দেখাই নি সূর্যাস্তের নীলিমার রঙিন উদ্যান
আত্মম্ভরিতায় তবু চোখ রাখলি আঁস্তাকুড়ে,
ছেঁড়াখোঁড়া, ত্যক্ত, বিরক্ত বেসামাল বীজাণুর উৎসবে

সান্ধ্যভ্রমণ ভালো, হাওয়া খোলামেলা,
অস্থির চরণ তোর নিয়ে গেলো কাফের গুমোটে
যেখানে জটলা পাকায় সমবয়সী বেকার হা-ঘরে বাউণ্ডুলে

সৎসঙ্গ লাগে নি ভালো ? সজ্জনের কথা ?
কৃমিও যায় না যেই দুর্গন্ধের নর্দমায়, পাঁকে
সেখানে ভাসালি বুক? যেন আমি রাখি নি পেতে ফেননিভ দুগ্ধশয্যা,

শীতরাতে একটি গরম শাল, নীলরঙা জামা ?
কিছুই ধরে না মনে বুজরুকিভরা হে ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রের পণ্ডিত,
নগ্নপাত্রে নেচে নেচে অবশেষে নিবি কি সন্ন্যাস!

দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে উৎসবের ঋতুতে
কোন ভূতে পেল তোরে ? যখনই চেয়েছি কোনো গান
ত্রিকাল বধির করে অশুভ জ্যোতিষী যেন, উদ্‌ভ্রান্ত গণক
ছুঁড়ে দিলি কেবল চিৎকার!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্রজাল

রাত্রে চাঁদ এলে
    লোকগুলো বদলে যায়
দেয়ালে অদ্ভুত আকৃতির ছায়া পড়ে
যেন সারি সারি মুখোশ দুলছে কোনো
অদৃশ্য সুতো থেকে
    আর হাওয়া ওঠে
ধাতুময় শহরের কোনো সংগোপন ফাটল
কিংবা হা-খোলা তামাটে মুখ থেকে
হাওয়া ওঠে, হাওয়া ওঠে
সমস্ত শহরময় মিনার চুড়োয় হাওয়া ওঠে

(ওড়ে কত শুকনো কাগজের মতো স্বগতোক্তি
খড়কুটোর মতো ছোট ছোট স্বর, নৈরাশ্যের কালো ফুল)

কেউ ঢোকে পার্কে, ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা
নেমে যায় পিচ্ছিল কৃমির মতো
    স্বপ্নের সুড়ঙ্গপথে
সহজ, অবাধ; ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে
ইচ্ছার মদির চাপে যেন শুঁড়ির রুক্ষ হাতে
    টলটলে দ্রাক্ষার মতো
ঠোঁট ফাটে

তখন মুঞ্জরিত মাংসের ঘরে
পাঁচটি প্রদীপ আনে আলোকিত উৎসবের রাত
(ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে)

তখন ইন্দ্রিয়ের সবুজ ঝোপে
পাঁচটি লাল ফুল আনে সৌরভের রাত
(ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে)

তখন মোটরের অপরিসর ফিকে আঁধারে
চিনতে কষ্ট হয় সঙ্গিনীর অঙ্গরেখা
উরুর গঠন আর সফেদ দন্তরাজি;
দেয়ালে জানালার কাঁচে নিরন্তর ছায়া নড়ে
লোকগুলো বদলে যায়, বদলে যায়, বদলে যায়
রাত্রে চাঁদ এলে–

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলোকিত গণিকাবৃন্দ

শহরের ভেতরে কোথাও হে রুগ্ন গোলাপদল,
শীতল, কালো, ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা,
অস্পৃশ্য বাগানের ভাঙাচোরা অনিদ্র চোখের অপ্সরা,
দিকপ্রান্তের ঝলক তোমরা, নিশীথসূর্য আমার!
যখন রুদ্ধ হয় সব রাস্তা, রেস্তোরাঁ, সুহৃদের দ্বার,
দিগন্ত রাঙিয়ে ওড়ে একমাত্র কেতন,–তোমাদেরই উন্মুক্ত অন্তর্বাস,
–অদ্ভুত আহ্বান যেন অস্থির অলৌকিক আজান।

সেই স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা উপাসনালয়ে পেতে দাও
জায়নামায, শুকনো কাঁথা, খাট, স্তূপ স্তূপ রেশমের স্বাদ।
আলিঙ্গনে, চুম্বনে ফেরাও শৈশবের অষ্ট আহ্লাদ!
বিকলাঙ্গ, পঙ্গু যারা, নষ্টভাগ্য পিতৃমাতৃহীন,–
কাদায়, জলে, ঝড়ে নড়ে কেবল একসার অসুস্থ স্পন্দন
তাদের শুশ্রূষা তোমরা, তোমাদের মুমূর্ষু স্তন!

ক্ষণকাল সে নকল স্বর্গলোকের আমি নতজানু রাজা
কানাকড়ির মূল্যে যা দিলে জীবনের ত্রিকূলে তা নেই
অচির মুহূর্তের ঘরে তোমরাই তো উজ্জ্বল ঘরনী
ভ্রাম্যমাণেরে ফিরিয়ে দিলে ঘরের আঘ্রাণ,
তোমাদের স্তব বৈ সকল মূল্যবোধ যেন ম্লান!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রালোকে

কী শস্তায় পরিষ্কার হলো ঊর্ণাজাল,
হলুদ কাগজ, কাঁটাতার ময়লা পুরনো দাগ,
দেয়ালের বালি; বিশল্যকরণী দিয়ে ছুঁলো চাঁদ
সন্ধ্যায়,–বিস্তীর্ণ ম্লান লম্বা জ্যোতিপাতে।
অতর্কিতে একটি কড়ির বাঁকে, ঠাণ্ডা ফুটপাতে
অচেনা গলার ভাঙ্গা ভারী গান অদৃশ্য গলিতে,–
বিধ্বস্ত, স্মৃতির মতো পাঠালো সে ঝলকে ঝলকে পলক-না-পড়া হাওয়া
ফিরলো উষ্ণতা যেন পুরোনো কোমল মখমলে; বাতি-জ্বালা, লাল, নীল
কাঁচের দোকান একপাল অপ্সরীর মতো নেচে নেচে
দেখালে কত-না রঙ্গ, যেন তারা কত মোহনীয়,
একরাশ ধুলোপাতা বিশুদ্ধ আনন্দে শুধু তাল ঠুকে গেল।

পরাস্ত সকল ইচ্ছা, উদয়াস্ত যা-যা ভেবে মরি
তার কোনো সুন্দর সচল সমাধান করে দিতে পারবে না এই হাওয়া
শুধু এক নির্বোধ, পরম বালখিল্যতায় জড়িয়ে ধরতে চায় গলা।
ফিরে ফিরে ভঙ্গা হারমোনিয়াম আনে অতীত আর্দ্রতা
'হে আমার প্রেম, নিষ্প্রাণ ময়ূরপঙ্খী কোনো জলে ভাসবে না ?'
(বালির তরঙ্গে তার নিতম্বের কঠিন করোটি, কোনো কান্নাই ছোঁবে না)
হে আমার প্রেম, নিষ্প্রাণ ময়ূরপঙ্খী দাঁড় পড়ে হৃৎস্পন্দনে
আমার অপেক্ষা ফুরোবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই শীতে

শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না যেন
বেঁচে থাকা ছাড়া, বসন্তের শিথিল স্তন
নিঃশেষে পান করে নিঃস্বার্থ মাটি
লতা-গুল্ম গাছ কাক শালিক চড়ুই
এমনকি অসহায় গর্তের দেয়ালের জীব...

সে উদ্বৃত্তের দিনে বিপ্রলাপী স্বভাবে যার
আসক্তি আসবে, সেতো মৃত্যুগামী, ডোবেই
এমনকি অগ্রজও টলে, অচিরে হারায়
মনের সমতা সেই ঘনতা : প্রজ্ঞা যার নাম।
কেননা বসন্ত শুধু কবির হৃদয়ে নয়,
কারো-কারো মগজেও নামে;
এবং
তারাও হন্যে হয়, অন্ধকার আশ্লেষে কাঁপে।

অথচ এ-শীতে একা, উদ্ধত আমি,
আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ
প্রতিবেশী পুরুষ নারী আর বিশাল
যে রিক্তগাছ, সে ঈর্ষায় সুখী
নিয়ত উত্তাপ দিই বন্ধু পরিজনে।
আমি শুধু
একাকী সবার জরার মুখোমুখি।

এবং আরো একজনের চোখে দেখি
লক্ষ্য সূর্যের আসা-যাওয়া এবং সেও একা
আমারই আত্মার মতো
প্রাঙ্গণের তরুণ কুকুর!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রাহত সাঙাৎ

দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাৎ
কী ইৎরামি জানে ওই চাঁদ
অপেক্ষায় কল্কে জ্বলে গ্যালো, সাঁঝ-রাত
আ-তু আ-তু ডেকে-ডেকে বয়ে গ্যালো
আইলো না উঁচু টিবি থেকে নেমে রুপার মোরগ
ত্রি-ভুবনে কে কোথায় ধরা পড়ে যায় তার নেই ঠিকঠাক্
অখন যখন সব কুয়াশায় ঘুমের মোড়ক
সেই দেখা দিলে ত' সাঙাৎ
আমাগো ঝুলিতে নয়, হায়রে বরাৎ
নোংরা জলে ভেসে এলে যেন পাতিহাঁস
আন্ধা যে সে বান্ধা পড়ে যায় এমন হঠাৎ
কোকিলও মাঝে-মাঝে বনে যায় কাক
মালিক স্বয়ং সত্য করে দেন ফাঁস
অতএব জানতে যদি পারে জ্যান্ত ধীমান বেবাক
চন্দ্রমাই আমার সাঙাৎ!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অগ্রজের উত্তর

নো, শহীদ সেতো নেই; গোধূলিতে তাকে
কখনো বাসায় কেউ কোনোদিন পায় নি, পাবে না।
নিসর্গে তেমন মন নেই, তাহলে ভালোই হতো
অন্তত চোখের রোগ সযত্নে সারিয়ে তুলতো হরিৎ পত্রাদি!
কিন্তু মধ্য-রাত্রির সশব্দ কড়া তার রুক্ষ হাতের নড়ায়
(যেন দুঃসংবাদ–নিতান্ত জরুরি) আমাকে অর্ধেক স্বপ্ন থেকে
দুঃস্বপ্নে জাগিয়ে দিয়ে, তারপর যেম মর্মাহতের মতন
এমন চিৎকার ক'রে 'ভাই', ভাই, ভাই' ব'লে ডাকে,
মনে পড়ে সেবার দার্জিলিঙের সে কী পিছল রাস্তার কথা,
একটি অচেনা লোক ওরকম ডেকে-ডেকে-ডেকে খসে পড়ে।
গিয়েছিলো হাজার-হাজার ফিট নিচে!

সভয়ে দরোজা খুলি– এইভাবে দেখা পাই তার–মাঝরাতে;
জানি না কোথায় যায়, কী করে, কেমন করে দিনরাত কাটে
চাকুরিতে মন নেই, সবর্দাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা
মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে!

না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো–শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রমানেই লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের
সাঁজোয়া বাহিনী,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার,
কারফিউ, ১৪৪–ধারা,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে ধাবমান খাকি,
জিপের পেছনে মন্ত্রীর কালো গাড়ি,
কাঠগড়া, গরাদের সারি সারি খোপ,
কাতারে কাতারে রাজবন্দি;
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় মিছিল থেকে না-ফেরা
কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় তেজগাঁ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা,
হাসপাতালে আহত মজুরের মুখ।
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় নিষিদ্ধ প্যামফ্লেট,
গোপন ছাপাখানা, মেডিক্যাল,
কলেজের মোড়ে 'ছত্রভঙ্গ জনতা–
দুইজন নিহত, পাঁচজন আহত'–রাষ্ট্র বললেই
সারি সারি ক্যামেরাম্যান, দেয়ালে পোস্টার :
রাষ্ট্র বললেই ফুটবল ম্যাচের মাঠে
উঁচু ডায়াসে রাখা মধ্য দুপুরের
নিঃসঙ্গ মাইক্রোফোনে

রাষ্ট্র মানেই স্ট্রাইক, মহিলা বন্ধুর সঙ্গে
এনগেজমেন্ট বাতিল,
রাষ্ট্র মানেই পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত
ব্যর্থ সেমিনার
রাষ্ট্র মানেই নিহত সৈনিকের স্ত্রী
রাষ্ট মানেই ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়া।
রাষ্ট্র মানেই রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা
রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা মানেই
লেফ্‌ট্‌ রাইট, লেফ্‌ট্‌ রাইট, লেফ্‌ট্‌–!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেষ বংশধর

'পিতা, পিতা, পিতা'-বলে চিৎকার করছো কেন তুমি,
'বা'জান বা'জান'-ব'লে পাড়া মাত ?

তোমার পিতার কাছে ছিলো নাকি এক জোড়া নীল চোখ
স্কন্ধে কোনো টিয়া ?
হস্তধৃত এক ঐন্দ্রজালিক লাটাই
নীলাভ আকাশে-ওড়া শাদা বগার মতন ক্রন্দন-পেরুনো কোনো ঘুড়ি ?
ছিলো নাকি সচ্ছল স্বর্গের চাবি ? রঙবেরঙের কিছু শার্ট ?
আন্ধার পতন কিংবা সূর্যকরোজ্জ্বল
মুসার উত্থান ?

দুর্বিনীত দরবেশের মতো সোনালি বাঘের পিঠে চ'ড়ে
দেখেছেন তেপান্তর তিন দুনিয়ার কূল উপকূল ?
গোড়ালির চাপে তাঁর তরুণ ঘোড়ার মতো ছুটে গেছে প্রাচীন প্রাচীর ?
নাকি আস্তাবলে আজীবন বাঁধা ছিলো সফেদ বোররাক ?
তিনি কি জানতেন সেই অলৌকিক
আশ্চর্য চিচিং ফাঁক
অবলীলাক্রমে যাতে খুলে যায় শীতরাতে নিঃশব্দে দরোজা
তুমি যার বাইরে দাঁড়িয়ে,
স্বপ্নে, জাগরণে বহুকালব্যাপী
ঘর ঘোর দুর্যোগের আবহাওয়ায় ?
তাঁর কাছে ছিলো নাকি বৃষ্টির বিরুদ্ধপক্ষ কোনো মন্ত্রপূত
নরম বর্ষাতি ?

কাকে ডাকছো মিছামিছি ? তুমি ঠিক জানো, তোমার পিতা কি
তোমার মা'য়ের দৃঢ়জানু প্রেমিক ছিলেন ? তাঁর জরায়ুর
অন্ধকারে প্রাণবীজ জ্বলজ্বল ক'রেছিল কালপুরুষের মতো
নক্ষত্রের ফোঁটায়-ফোঁটায় ?

আর তাঁর বলীয়ান শিশ্নোদর ঘিরে
সন্তদের মাথার মতন জ্যোতির্মণ্ডলও দেখেছেন তিনি ?
তোমার জন্মের উৎস ছিলো নাকি লোকাতীত পরিকল্পনা কারো ?
নির্বিকার, নির্বিচার বিবাহের মনোহীন রীতি ছাড়া অন্য কিছু ?
আরও কিছু ? প্রেম ?

'পিতা, পিতা, পিতা'-ব'লে চিৎকার ক'রছো কেন তুমি
'বা'জান, বা'জান'-ব'লে পাড়া মাত ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্য কিছু না

জুঁই, চামেলি, চন্দ্রমলি-কা, ওরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে
তোমার পলক-না-পড়া কিশোর চোখের জন্যে,
তোমার রক্তের ভেতরে, জনতাকীর্ণ পেভমেন্টে অবলীন
চেতনাচেতনে। অথচ লাল, নীল শার্ট প'রে
বিরুদ্ধ বাতাসে
ভুল স্টেশনের দিকে শিস দিতে দিতে চলেছো যেখানে,
সাদা উরু আর শিশ্নের সঙ্কেত ছাড়া
লাল সিগন্যাল জ্বেলে
কোনো ট্রেন কখনো দাঁড়াবে না।
মসৃণ ত্বকের ওপর নির্ভর ক'রে
বিদেশী ম্যাগাজিনের মতন তুমি
ঝকমকে, ঝলমলে হ'য়ে হাতে-হাতে কদ্দূর যাবে ?

আমি তো স্থির জানি
তোমার ওই সদ্য তিরিশ-পেরুনো কৃচিৎ পাকা চুল
—কিছু না,
শরীরের সামান্য শিথিলতা
—কিছু না,
সূর্যাস্তের মতো দেহভার
কিছু না।
মাতৃ-চুম্বনাকাঙ্ক্ষী স্কুল-ফেরা ক্লান্ত কিশোর ছাড়া
এখনও তোমার অস্তিত্ব
অন্য কিছু না।

জুঁই, চামেলি, চন্দ্রমল্লিকা, ওরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে,
প্রিয়জনদের মতো ওরা কেউ নরমাংসভুক নয়
বন্ধুদের দৃষ্টির মতো ওরা কেউ তলোয়ারের
পৃষ্ঠপোষক নয়
কৈশোরিক চোখের ছায়ায় ওদের ঢেকে দাও,
কেননা আমি তো স্থির জানি,
অসংখ্য বিদ্রূপ-বেঁধা, পিতার বিশালবক্ষপ্রার্থী,
রুক্ষ চুলের এক বেদনাব্যাকুল বালক ছাড়া
তুমি আজও,
আজও,
অন্য কিছু না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের চৈতন্যপ্রবাহে তুমি ট্রাফিক আইল্যান্ড
হে রবীন্দ্রনাথ!
দাঁড়িয়ে আছো যেন
সোনালি, অক্ষম পুলিশ এক
সর্বদা জ্বলছে তোমার লাল, নীল, সবুজ
সিগন্যাল
বাংলাদেশ নামে একফোঁটা অচেনা স্টেশনে
পৌঁছুতে হ'লে
নিজের সমস্ত বিষয়-আশয় বেচে দিয়ে
তোমার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে নাকি
আমার টিকিট ?

তোমার স্বদেশে, কবি, আমরা কয়েকজন
ট্যুরিস্টের মতো আজো
ঘুরছি ফিরছি
ড্রাগস্টোরের আশপাশে,
ঝুলিয়ে স্টেথিসকোপ নিঃশব্দে তুমি হেঁটে গেছো
কিছুক্ষণ আগে;
অথচ করিডরের সারি সারি টুল-বেঞ্চির ওপর
আমি ছিলাম ব'সে
অচিকিৎস্য রোগীদের মলিন কাতারে।

হে অলীক ডাক্তার, তুমি আমাদের
ডাক-বিভাগ থেকে
পাও নি আমার পোস্টকার্ড কোনো ?
আমি তো এক তোড়া চিঠি লিখে
প্রাঞ্জল ভাষায়
ব্যামোর বর্ণনাগুলো সযত্নে দিয়েছি।
ভ্রূক্ষেপ করো নি তুমি, তুবি জনশ্রুতি
যেহেতু সহায়
আমি তাই তোমাকে এক আলমিরা
নিদ্রার বর্ণালি বড়ি ভেবে শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত রাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্ভয়ে বাড়িতে ফিরে
জামা-না-খুলেই
নিঃশব্দে চিৎপাত হয়ে
রাতভর দেখেছি কেবল ওষুধের শিশির মতন
নক্ষত্রের উজ্জ্বল তরল
ফোঁটায়-ফোঁটায়
ঝ'রে পড়ছে ঠোঁট-তালু-জিহ্বাহীন বধির ফুটপাতে।

জানি, চিকিৎসক নও তুমি
কিম্বা ড্রাগস্টোরের কোনো ওষুধ বিক্রেতা;
দিনের শুরুতে তুমি
মিশে আছো অন্ত্রের অম্লরসে,
অনিদ্র রাতের ভোরে যেন টেবিলে সাজানো প্রাতঃরাশ
মেধার ভেতরে তুমি, মজ্জায়, শিরায়, মর্মে
ওঁৎ পেতে
শিকারি বেড়ালের মতো
নিয়ে গেছো আমাদের সবগুলো সোনালি-রুপালি মাছ;
রবিনহুডের মতো লুট ক'রে
আমাদের বিব্রত বাণিজ্যালয়, বিস্ফারিত ব্যাঙ্ক
সব টাকা-পয়সা ফের বিতরণ ক'রে দিলে
যে ফকির মিসকিনের ভিড়ে,
আমি সেই মিছিল থেকে খ'সে প'ড়ে
একটি চকচকে টাকা
আঙুলের নিপুণ তুড়িতে গীটারের মতো
বাজিয়ে চলেছি
যেখানে–
তুমি সে রাতের পার্কে আমার আলো-জ্বলা
অন্তিম রেস্তোরাঁ !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার

স্টেনগান গর্জনের শব্দে পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে যায়,
বিকলপক্ষ কবিতা আমার তুমি এই জর্নালের মধ্যে,
কখনো অন্ধকার দেরাজে
গুটিশুটি মেরে মুখ বুজে
প'ড়ে আছো–যেন মৃত রাজহাঁস,
নাকি কার্তুজশূন্য, জং-ধরা
ব্যবহারের অযোগ্য কোনো প্রাচীন পিস্তল। অথচ তবুও
তোমার মমতা আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। যেদিন অচেনা
কয়েকটা গলা আর ভারি ট্রাকের আওয়াজ মাড়িয়ে
কুচকাওয়াজ-ভরা সন্ত্রাসে কেঁপে উঠলো এ তল-াট
সার্চ-লাইটের আলোয়,
তখন যদিও ছিলো না অস্ত্র আমার কাছে, তবু ভয়ে
কেঁপে উঠেছিলো সারা বাড়ি। কিন্তু আমি,
কাপুরুষ, ভীরু, এই আমি অসীম সাহসে
চকচকে সঙীনবিদ্ধ হ'তে দিই নি তোমাকে
এমনকি তোমার অগ্ন্যুৎসবেও হই নি সহায়।

স্বাধীনতার সৈনিক যেমন উরুতে স্টেনগান বেঁধে নেয়,
কিম্বা সন্তর্পণে গ্রেনেড নিয়ে হাঁটে,
তেমনি আমিও
গুপ্তচরের দৃষ্টির আড়ালে অতি যত্নে লুকিয়ে রেখেছি
যেন তুমি নিদারুণ বিস্ফোরণের প্রতিশ্রুতিতে
খুব বিপজ্জনক হ'য়ে আছো।

মনে আছে একদিন রাত্রে বাগানের মাটি খুঁড়ে
তোমাকে শুইয়ে দিয়েছি খুব যত্নে। কিন্তু যখন
কয়েকটা বিদেশি ভারি বুট তোমাকে
অকাতরে মাড়িয়ে কড়া নাড়লো দরোজায়
তুমি কিন্তু মাইন-এর মতো প্রতিরোধে
বিস্ফোরণ করো নি।

হে আমার শব্দমালা, তুমি কি এখনো বৃষ্টিশুভেজা
বিব্রত কাকের মতো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার ক্ষমতাহীন ডাইরির পাতার ভেতরে বসে নিঃশব্দে ঝিমুবে,
তাহ'লে তোমার ধ্যানে আবাল্য দুর্নাম কিনে আমি
অনর্থক বড়াই করেছি।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনিদ্রা এবং অস্থির জাগরণ ছাড়া তুমি কিছু নও,
কপালে দাও নি তুমি রাজার তিলক কিম্বা প্রজার প্রতিশ্রুতি
তবে কেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছি তোমার পদমূলে!

বরং এসো করমর্দন ক'রে যে যার পথের দিকে যাই,
তবু আরো একবার বলি :
যদি পারো গর্জে ওঠো ফিন্ডগানের মতো অন্তত একবার...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী
গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে
মার্চপাস্ট ক'রে চ'লে যাবে
এবং সাল্যুট করবে
কেবল তোমাকে প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
বন-বাদাড় ডিঙিয়ে
কাঁটা-তার, ব্যারিকেড পার হ'য়ে, অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে
আর্মার্ড-কারগুলো এসে দাঁড়াবে
ভায়োলিন বোঝাই ক'রে
কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো–
এমন অবস্থা করবো
বি-৫২ আর মিগ-২১গুলো
মাথার ওপর গোঁ-গোঁ করবে
ভয় নেই, আমি এমন অবস্থা করবো
চকোলেট, টফি আর লজেন্সগুলো
প্যারাট্রুপারদের মতো ঝ'রে পড়বে
কেবল তোমার উঠোনে প্রিয়তমা।

ভয় নেই, ভয় নেই,
ভয় নেই...আমি এমন ব্যবস্থা করবো
একজন কবি কমান্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী
এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়
সবগুলো গণভোট পাবেন একজন প্রেমিক, প্রিয়তমা!
সংঘর্ষের সব সম্ভাবনা, ঠিক জেনো, শেষ হ'য়ে যাবে–
আমি এমন ব্যবস্থা করবো, একজন গায়ক
অনায়াসে বিরোধী দলের অধিনায়ক হ'য়ে যাবেন
সীমান্তের ট্রেঞ্চগুলোয় পাহারা দেবে সারাটা বৎসর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাল নীল সোনালি মাছ–
ভালোবাসার চোরাচালান ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ হ'য়ে যাবে, প্রিয়তমা।

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো মুদ্রাস্ফীতি কমে গিয়ে বেড়ে যাবে
শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা প্রতিদিন
আমি এমন ব্যবস্থা করবো গণরোষের বদলে
গণচুম্বনের ভয়ে
হন্তারকের হাত থেকে প'ড়ে যাবে ছুরি, প্রিয়তমা।

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
শীতের পার্কের ওপর বসন্তের সংগোপন আক্রমণের মতো
অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে-বাজাতে বিপ্লবীরা দাঁড়াবে শহরে,

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
স্টেটব্যাঙ্কে গিয়ে
গোলাপ কিম্বা চন্দ্রমলি-কা ভাঙালে অন্তত চার লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে
একটি বেলফুল দিলে চারটি কার্ডিগান।
ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
নৌ, বিমান আর পদাতিক বাহিনী
কেবল তোমাকেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে-ঘিরে
নিশিদিন অভিবাদন করবে, প্রিয়তমা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ সারাদিন

বাতাস আমাকে লম্বা হাত বাড়িয়ে
চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘুরে বেড়িয়েছে আজ সারাদিন
কয়েকটা লতাপাতা নিয়ে
বিদঘুটে বাতাস,
হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে আমাকে,
লাল পাগড়ি-পরা পুলিশের মতো কৃষ্ণচূড়া
হেঁকে বললো:
'তুমি বন্দি'!

আজ সকাল থেকে একজোড়া শালিক
গোয়েন্দার মতো আমার
পেছনে পেছনে ঘুরছে
যেন এভিনিউ পার হ'য়ে নির্জন সড়কে
পা রাখলেই আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবে ঠিক!

'তুমি অপরাধী'
–এই কথা ঢাক–ঢোল পিটিয়ে যেন
ব'লে গেল বজ্রসহ এক পশলা হঠাৎ বৃষ্টিপাত–
'তুমি অপরাধী–
মানুষের মুখের আদলে গড়া একটি গোলাপের কাছে।'

বৃষ্টিভেজা একটি কালো কাক
একটা কম্পমান আধ-ভাঙা ডালের ওপর থেকে
কিছুটা কাতর আর কিছুটা কর্কশ গলায়
আবার ব'লে উঠলো : তুমি অপরাধী!

আজ সারাদিন বাতাস, বৃষ্টি আর শালিক
আমাকে ধাওয়া ক'রে বেড়ালো
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত
তোমার বাড়ির
কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গেলাম
কিন্তু সেখানে ঘাটের ওপর এক প্রাচীন বুড়ি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সোনার ছাই দিয়ে ঘটি-বাটি মেজে চলেছে আপন মনে।
একটা সাংঘাতিক সূক্ষ্ম ধ্বনি শুয়ে আছে
পিরিচে, পেয়ালায়।

ঐ বাজনা শুনতে নেই
ঐ বাজনা নৌকোর পাল খুলে নেয়
ঐ বাজনা স্টিমারকে ডাঙার ওপর আছড়ে ফ্যালে
ঐ বাজনা গ্রাস করে প্রেম, স্মৃতি, শস্য, শয্যা ও গৃহ

তোমার বাড়ির
কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গিয়েছিলাম।
কিন্তু হাতভর্তি শালিকের পালক
আর চুলের মধ্যে এলোপাতাড়ি বৃষ্টির ছাঁট নিয়ে
উল্টোপাল্টা পা ফেলে
তোমার দরোজা পর্যন্ত যেতে ইচ্ছে হলো না।

ঐ শালিকের ভেতর উনুনের আভা, মশলার ঘ্রাণ।
তোমার চিবুক, রুটি আর লালচে চুলের গন্ধ,
ঐ বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে পাতা আছে তোমার
বারান্দার চেয়ারগুলো
তাহলে তোমার কাছে গিয়ে আর কি হবে!

আজ সারাদিন একজোড়া শালিক
গোয়েন্দা পুলিশের মতো
বাতাস একটা বুনো একরোখা মোষের মতো
আমাকে ধাওয়া করে বেড়ালো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত

আমি অনেকদিন পর একজন হা-ঘরে
উদ্বাস্তু হ'য়ে চরকির মতো গোটা শহর ঘুরে বেড়ালাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেন যেতে চাই

আমি তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
ঝক্‌ঝকে নতুন একটি সেতু
যেমন নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ঐ লোকগুলোর কাছে পৌঁছে যেতে চায়
কিন্তু তামা ও পিতলসহ বাসন-কোসন, চিঁড়ে-গুড় ইত্যাদি গোছাতে
তোমরা ব্যস্ত, বড্ড বেশি ব্যস্ত।

মাঝে মাঝে দূর থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তোমাদের ব্যস্ততা দেখতে
ভালোবাসি।

সমুদ্র তরঙ্গগুলো সমুদ্রকে নিয়ে এ্যাতো ব্যস্ত নয়,
অরণ্যের অভ্যন্তরে ক্ষুধার্ত, স্বাধীন বাঘ হরিণের জন্য এ্যাতো
ব্যস্ত নয়,
দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রেমিকের হাত ব্রেসিয়ারের ভেতর এ্যাতো
ব্যস্ত নয়,

আমি তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
শীতের পর প্রথম উল্টোপাল্টা বাতাস যেমন
প্রত্যেকটি ফাঁক-ফোকর এবং রন্ধ্র দিয়ে যেতে চায় তোমাদের
চোখে-মুখে-চুলে
কিন্তু তৈজসপত্রের রঙ, টেবিল ও চেয়ারের ঢঙ, জানালার পর্দা
ইত্যাদি
বদলাতে, গোছগাছ করতে
তোমরা ব্যস্ত, বড্ড বেশি ব্যস্ত।

কৃচিৎ-কখনো খুব কাছ থেকে তোমাদের প্রচণ্ড ব্যস্ততা আমি দেখি,
দিগন্ত আঁধার-করা সজল শ্রাবণও বৃষ্টি ঝরানোর জন্য
অমন ব্যস্ত নয়,
তাক-করা রাইফেলের অমোঘ রেঞ্জ থেকে উড়ে পালানোর জন্য
হরিয়ালের ঝাঁকও অমন ব্যস্ত নয়,
কর্কট-রোগীর দেহে ক্যান্সারের কোষগুলো ছড়িয়ে পড়ার জন্য
অমন ব্যস্ত নয়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তো তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
ইন্দ্রনীল একটি মোহন আংটি
প্রেমিকের কম্পমান হাত থেকে প্রেমিকার আঙুলে যেমন
উঠে যেতে চায়,
কিন্তু চাষাবাদ, বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক শিল্প
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে
তোমরা ব্যস্ত, বড্ড বেশি ব্যস্ত।

হরিণ-হননকামী ব্যাধের মাংসল মুঠো থেকে ছুটে-যাওয়া
বল্লমের মতো তোমরা ব্যবস্ত
দিগভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত পথিককে গিলে ফেলার জন্য উত্তর বাংলার
চোরাবালির মতো তোমরা ব্যস্ত।
চিরচেনা বৃক্ষরাজিকে পল্লবশূন্য করার জন্য শীতের জটিল
বিস্তারের মতো তোমরা ব্যস্ত
যাত্রী নিয়ে ঘর-ফেরা নৌকাগুলো হরণ করার জন্য চোরাস্রোতে
এবং ঘূর্ণিপাকের মতো তোমরা ব্যস্ত

তোমরা ব্যস্ত, তোমরা ব্যস্ত, তোমরা ব্যস্ত
তোমরা বড্ড বেশি ব্যস্ত
অথচ আমি তো আজীবন তোমাদেরই দিকে যেতে চাই।
কেন যেতে চাই!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা মরা শালিক

(আবদুল মান্নান সৈয়দ-কে)

একটা মরা শালিক দেখে এই উত্তেজনার কথা আমার তো নয়।
বন্ধুদের মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্যে আমি উদাসীনভাবে হেঁটে
গেছি মর্গে, বহুবার,
পলেস্তরা খসে-পড়া দেয়ালের সঙ্গে চোখ বাঁধা প্রিয়জনকে দেখেছি
স্টেনগানে পরিবৃত:
দেখেছি পিতাকে লাবণ্যের বাল্যকাল ছিঁড়ে
কবরখানার দিকে চলে যেতে, কৈশোরে মা'কেও;
শক্ত ছুরিতে বেঁধা অসংখ্য মৃত্যু পার হ'য়ে
নিদারুণ এক পাকাপোক্ত মানুষের মতো
অথবা সেই সমর্থ বৃদ্ধের মতোন আত্মরক্ষাময় স্থবিরতায়
পৌঁছে গেছি নিরাপদে, যিনি পুত্র এবং আপন
পুত্রের পুত্রকে দেখেছেন
হঠাৎ ম'রে যেতে, দেখেছেন–
স্বাধীনতা, স্বজন হনন, ট্রেঞ্চ, কামানের ঝলমলে নল জ্যোৎস্নারাতে;

অথচ ইতিহাসের একেকটি ভয়ঙ্কর বাঁকে দাঁড়িয়েও
তিনি ভোলেন নি কখনও নিশ্চিন্তে তাঁর
প্রিয় পানগুলো চিবুতে, এইতো সেদিনও তাঁকে দেখলাম
প্রতিবেশীদের শবযাত্রায় নিশ্চিত সঙ্গী হয়ে, একাকী আজিমপুর থেকে
বেরিয়ে এসেই কবরখানার গেটে–পানের দোকানে
'আরেকটু জর্দা দাও' বলে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর
লোলচর্ম, শিরা-ওঠা হাত!
আমারও চৈতন্য এই শিরা-ওঠা বৃদ্ধের হাতের মতো
সবকিছু দেখেছিল ছুঁয়ে–শিশুর কোমল ত্বক,
নধর ছাগল ছানা, নিস্তল নারী ও গোলাপের চারা,
অকালে নিঃস্পন্দ সব বন্ধুদের চোখ।

এখন তো উত্তর তিরিশ আমি, অল্প বয়সেই অর্থাৎ চব্বিশ
কিংবা পঁচিশের ঢের আগে, মায়ের মৃত্যুর পর
আমিও ভেবেছি : 'এবার অপার স্বাধীনতা, যদিও নেহাৎ ব্যক্তিগত,
তবুও, আর তো পরাধীন নই আমি'–অভিভাবকহীনতাকেই
সেদিন ভেবেছি স্বাধীনতা, এখনও ভাবি। এই যেমন ধরুন
একেক সময় একেকটি দেশে কেউ কেউ শিরস্ত্রাণের প্রভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অত্যধিক অভিভাবক হয়ে ওঠেন বলেই মাঝে মাঝে এতো শোরগোল,
হৈহল্লা : 'সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র, গণতন্ত্র', বলে চিৎকার! আদর্শবাদও
ছিলো না আমার (আদর্শ কি অভিভাবক নয় ?)
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছি নটরাজের মতো,
নতজানু কখনো হই নি আমি গোলাপ অথবা রাঙা মেঘের স্বাস্থ্যের
কাছে,
কিংবা কোনো গম্ভীর শবযাত্রার কাছে,
তবুও কখনো-সখনো অভিভাবক এসেছে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের
মতো দ্রুতবেগে
মহিলার সোনালি চুল হ'য়ে জুঁই কিংবা চন্দ্রমলি-কার ছদ্মবেশে।
তাদের অচির আধিপত্য মেনে নিয়েও
সব শোক, প্রেম, হতাশার পরপারে দাঁড়িয়ে
সেই বৃদ্ধের হাত আমার চৈতন্য থেকে উঠে এসে
কবরখানার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছে
'–আরেকটু জর্দা দাও।'
অভিজ্ঞ বৃদ্ধের প্রজ্ঞা অর্জন করেছি ভেবে
উপেক্ষার উঁচু দুর্গে
রাজাধিরাজের মতো বসেছিলাম স্থবির, নিঃস্পন্দ
স্বায়ত্তশাসিত হৃদয় নিয়ে–নর্তকীদের মোহন উরুর পরপারে।

অথচ আজ ভোরে নৈশকালীন বাতাস ও বৃষ্টির পর
দরোজা খুলেই দেখি–উঠোনের কিছু প্রগাঢ় সবুজ
লতাপাতার মধ্যে একটা হলুদ মরা শালিক কাত হয়ে পড়ে আছে
তারপর সারাদিন সেই মরা শালিকটা
ঘুরে বেড়ালো আমার সঙ্গে সঙ্গে
আশ্চর্য নাছোড়বান্দা–ঘর থেকে ঘরে। রেস্তোরাঁয়,
রাস্তায়, আড্ডায়, ফুটপাতে, সর্বত্র সে গেল
আমার কাঁধের ওপর সওয়ার হয়ে : এবং আমার
মনে এলো অনেকদিন আগের কথা–শীতের সকালে
ও রকম শালিক রঙা একটা হলুদ ওভারকোট পরে
আমি ঘুরে বেড়াতাম চৌধুরীদের বাগানে,
কিন্তু তাতে কী ? একটা মরা শালিক
আমার ওপর এমন দারুণ আধিপত্য
বিস্তার করবে কেন ? এই বিবর্ণ হলুদ আমার অভিভাবক
হয়ে উঠবে কেন ? আমি তো মৃতের উল্টে যাওয়া চোখের সাদা
অসংখ্যবার দেখেছি ॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল

১২ই নভেম্বর, ১৯৭০
এতসব ছদ্মবেশ আছে চৌদিকে, আজন্ম উন্মূল মানুষ
ভেবেছে তারও ঘর আছে, নিকেতনে ভ'রে আছে সমস্ত নিসর্গ
দুধ-সরোবর ব'লে ভেবেছে সে স্বপ্নগ্রস্ত চোখে দূর থেকে
অতল খাদের পর কুয়াশার নিস্তরঙ্গ নিরস্ত্র বিস্তার।
তাই সে বেঁধেছে ঘর সন্ধ্যার পাখির স্বরে, চুপিচুপি
চুরি ক'রে ঢুকে গেছে শিশিরের টলটলে ফোঁটার ভেতর
জ্যোৎস্নাকে করোগেট শিট ভেবে প্রাণদাত্রী নদীর নিক্কণে
তার সব নিরাপত্তা জমা আছে ভেবে বন্দনায় কণ্ঠ ছিঁড়েছে।

রাত্রে গাছের পাতায় আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে
খুচরো পয়সার মতো ছড়ানো জ্যোৎস্নারাজি দেখে
ভিক্ষুকের মতো বারবার আমিও দাঁড়িয়েছি
হাতের রুক্ষ তালু প্রসারিত ক'রে

দেখেছি উদ্বাহু আত্মীয়ের নৃত্য
সমুদ্রের ডুগডুগি শুনে
আমি তাই বহুবার ভেবেছি
আমার বুভুক্ষা
হয়তো মেটাতে পারে কোন ইন্দ্রধনু
কিংবা রাত্রে শাদা কুয়াশায় মোড়া
সেবাপরায়ণ গাছগুলো নিপুণ নার্সের মতো
দাঁড়াবে মাথার কাছে
ওষুধের ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু
প্রতিশ্রুতিশীল শিশির গলাধঃকরণ ক'রে
নিন্দ যাবো নিশ্চিন্তে নিশীথে।

আজীবন লোকালয় থেকে আমি
পালাতে চেয়েছি–অন্ধকারে টর্চের আলোর চেয়েও
নির্ভরযোগ্য ভেবে জ্যোতিষ্মান পুষ্পরাজিকে,
মেধার চেয়ে অধিক মেধাবী ব'লে জেনেছি জ্যোৎস্নাকে।

জানি নিসর্গ এক নিপুণ জেলে
কখনো গোধূলির হাওয়া, নিস্তরঙ্গ জ্যোৎস্নার ফাঁদ পেতে রাখে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার অলৌকিক বড়শি থেকে ঝোলে পাখি, দোলে মেঘ
কোমল আহ্বানে উন্মুক্ত হয়ে যায়
কখনো নিশীথ আসে নিঃশব্দে নিশির মতো
বড়ো অন্তরঙ্গের মতো কড়া নাড়ে
বন্ধুর আজন্ম চেনা কণ্ঠস্বরের ডাক শুনে যে যায়
সে জানি দাঁড়ায় না আর
তাল তাল কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকে, একগুঁয়ে, বেসামাল।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৭০
নিসর্গ সেদিন তার ছদ্মবেশ খুলেছিল
একে একে সব অলংকার সে ফেলেছে,
যেমন রাজর্ষি যুবা প্ররোচিত হবার পর
বিয়ের সোনালি খাট থেকে হঠাৎ সভয়ে দ্যাখে
রক্ত-মাংসভুক ডাইনি এক তার প্রিয় প্রাসাদ জুড়ে
নর্তনে-কুর্দনে মেতে সব গয়না পরিত্যাগ করেছে।

নিসর্গ আবার তার মোহন ছদ্মবেশ পরেছে।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৭০
আমি তো শোকগ্রস্ত নই, সকালের প্রথম প্রস্থ চা।
প্রথামতো ভিজিয়েছে রুক্ষ গলা; গতকালের জলোচ্ছ্বাস বিধৃত
পত্রিকা দলা দলা হয়ে পড়ে আছে, হাতে আজকের কাগজ
ঠোঁটে চায়ের পেয়ালা, চোখে মৃত্যুর টাটকা ফটোগ্রাফ,
মনে : উপকূলবাসী নই বলে আশ্চর্য নিরাপত্তা !

চারদিকে চেয়ে দেখি সবকিছু ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে রয়েছে
যে যার ভূমিকায়–কোট ঝুলছে আলনা থেকে
আমার দেহের জন্যে সদ্য পাড় ভাঙা শার্ট আলিঙ্গন উন্মুক্ত করেছে
বেসিন থেকে উড়ে গিয়ে বাসি ব্লেড প্রজাপতির ছদ্মবেশ পরে নি
গর্জন করছে না পোষমানা শহুরে প্রকৃতি খাঁচায় পোরা কোনো
বাঘের মতোন।

আমি তো শোকগ্রস্ত নই, বঙ্গোপসাগরের নোনা পানি
আমার ক'ড়ে আঙুলও ছোঁয় নি, এমনকি ভেজাতে পারে নি
পা-জামার প্রান্তদেশ আর তা'ছাড়া চতুর্দিকে
(পৌর সমিতিকে ধন্যবাদ !) ঝোড়ো রাতের আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে
খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মতো জেগে আছে অজস্র ফুটপাত !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তো শোকগ্রস্ত নই, টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালে
প্রত্যেকে উত্তর দিচ্ছে যে যার নিজের ঘরে সুস্থ স্বাভাবিক।
তবু শোকের প্রস্তাব চারদিকে, জীবিতের মুখ যেন
মিশে গেছে মৃতের আদলে, শবযাত্রার মতো গম্ভীর মিছিলে
ছেয়ে গেলো আমার শহর, ভ'রে গেলো বঙ্গোপসাগরের গর্জনে।

২২শে নভেম্বর, ১৯৭০
শহরের রেস্তোরাঁগুলো নিজেদের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ে নি
দোকান-পাট উন্মুক্ত খোলা, মানবিক অহঙ্কারে মোড়া
ডি-আই-টি'র চূড়া মধ্যসমুদ্রে লাইট-হাউসের মতো
আমাদের ঝোড়ো জাহাজটিকে দেখাচ্ছে পথ
ট্রাফিক আইল্যান্ডে পুলিশ যেন নৌকোর পালের মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু হ'য়ে।
আর রাস্তার নেমপ্লেটগুলো কম্পাসের মতো মূল্যবান, ঝকঝকে।
চর্তুদিকে সব ঠিকঠাক এখনও রয়েছে,
এখনো শোকগ্রস্ত হই নি আমি, দেরাজ খুলি,
দেখি কাতারে কাতারে শুয়ে আছে মৃত শিশু
হাতের মুঠোর মধ্যে ন্যাপথলিন লাশের চোখের মতো শাদা
তাকিয়ে রয়েছে অপলক যেন আমার দিকেই
শরীরে জড়ানো র‍্যাপার আমুণ্ডু গিলেছে আমাকে

নির্বিবেকী কাফনের মতো
আর আমার ওয়ার্ডরোব থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে
আমারই কাপড়-চোপড় ফুলে যাওয়া লাশের মতো
যেখানেই হাত রাখি সবকিছু মৃতের দেহের মতো
শীতল, ঠাণ্ডা, হিম
ফ্রিজের হাতল, নিজেকে দেখার আর্শি, ক্ষুরের শক্তকাঠ
সবকিছুই ঠাণ্ডা, তুহিন।
মাথার ওপরে আবর্তিত পাশা শকুনের ছদ্মবেশে
উতরোল উৎসবে মেতেছে
এখনো চতুর্দিক ঠিকঠাক সবকিছু
অথচ গেলাসের জলে বিন্দু বিন্দু ঘূর্ণিতে
স্বজনের চেনা মুখগুলো ভাসছে লাশ হ'য়ে
কোথায় পালাবো, বলো, কার দ্বীপে, কোন ফুটপাতে
একটি বোটের মতো প্রিয়তম রেস্তোরাঁটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে
প'ড়ে আছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বতন্ত্র শতকের দিকে

শর্তবর্ষ পরমায়ু নয় যে আমার আমি তা জানি। তবু
আমার নিজস্ব শতকের গোধূলির দিকে তোমার মতন
অগ্রসরমান আমিও, এবং সেই সঙ্গে দেখে যাই
অস্তরাগ মানবিকতার।

আমাদের মধ্যে যারা, স্বপ্নকরোজ্জ্বল চোখে, পৌঁছে যাবে
নবীন শতকে, তারা কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমার ?
অথবা আমি কি সহোদর তাদের ? জানি না। কিন্তু অনবরত
বিদ্যুতে বিদ্যুতে স্বপ্নে স্বপ্নে ঝলছে উঠছে ফলপ্রসূহীন
আমার আকাশ।

তারাই যথার্থ যাত্রী যারা যায় হালকা-মন বেলুনের মতো
উনিশ শতকী এক মদ ও আফিমসেবী বিশৃংখল
নিঃসঙ্গ কবির এই তীক্ষ্ণ উচ্চারণ অমোঘ বাণীর মতো
আমার স্মৃতিতে গেঁথে আছে আজো।

তা হলে যথার্থ যাত্রী কারা ? কপর্দকহীন, হতাশা-শাসিত
স্বপ্নচ্যুত প্রাজ্ঞ অগ্রজেরা ? নাকি মৃত্যুর তামস শিল্পে অনভিজ্ঞ
সেই তরুণেরা যারা পিতার চুম্বন থেকে খুব সৃষ্টিশীলভাবে
ঝরে পড়ছে এখন উন্মোচিত পদ্মের মতো মাতৃজরায়ুতে ?
এবং অচিরে যারা বেরিয়ে পড়বে দিগ্বিদিক ?

নাকি তুমি ? আমি ? আমাদের মুখর, বাচাল নেতৃবর্গ ? কিংবা
আধুনিক রাষ্ট্রনায়কেরা, নির্দ্বিধায়, নিউক্লিয়ার রিএ্যাকটরগুলো
রোপণ করছে দেশে-দেশে, এবং সমরাস্ত্রের কন্ট্রাক্টর যাদের
ছায়াসহচর হয়ে ঘুরছে চতুর্দিকে ?

যেমন বৃষ্টির শেষে স্তরে স্তরে জমে থাকে মেঘ চেনা পৃথিবীর
বিভিন্ন আকাশে, তেমনি এই স্বপ্নাক্রান্ত ক্লান্ত শতকের
নষ্ট আকাঙ্ক্ষাগুলোর রাঙা ধ্বংসাবশেষের পাশে আজ
দাঁড়িয়ে রয়েছি যারা, আমাদের ন্যুব্জপৃষ্ঠে মরা হরিণের মতো
পড়ে আছে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ইতিহাসের।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এক রঙবেরঙের শতচ্ছিন্ন তালি-মারা জনগণতান্ত্রিক জামা
পরে আছি আমরা। এখনো উৎসবের সারি সারি
ঝাড়-লণ্ঠনের মতো সুষম ধন-বণ্টনের প্রতি আমাদের অনুরাগ
ঝলমল করছে এক নির্বোধ বিশ্বাসে। এবং এখনো
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো এসে লাগে টেলিভিশনে যখন
লেনিনের ভূলুণ্ঠিত মূর্তি দেখে পশ্চিমা পণ্ডিতকুল
মেতে ওঠে অশ্লীল উল্লাসে

শ্রেণীসাম্যের আদর্শে যারা একদা সংহত হয়েছিল এক
স্বপ্নজাত সোভিয়েত বলয়ে এখন কী যে অভিপ্রায় তাদের
বোঝা দায়।
তারা আজ পরস্পরের শোণিতে রাঙিয়ে নিয়েছে হাত
এবং আপাত মনোরম সূর্যাস্তের বর্ণালি বিভার সাথে
হয়ে গেছে একাকার।
দুই মহাযুদ্ধের শোণিতে রাঙা হয়ে আছে আমাদের
নিজস্ব শতক; এবং এখনো ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত আমারও স্বদেশ,
উপরন্তু রক্তাপ্লুত প্রতিবেশী ভারত এবং পূর্ব ইউরোপসহ
গৃহযুদ্ধ এখন আসন্ন প্রায় সমগ্র প্রাক্তন সোভিয়েত প্রাচ্যে।
(বৃথা গেল মাতার এ অশ্রুধারা, স্বজনের শোণিত প্রপাত)।
আমাদের অপব্যয়িত সোনালি যৌবন নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো
বলো আজ! গণতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু স্বাস্থ্যের ওপর আস্থা নেই আর।
এবং খুচরো পয়সার মতো পথে-বিপথে খরচ হয়ে গেছে
সমকালীন স্বপ্নগুলো আমার।
তাই বলি, বারবার বলি; না যেন পড়ে আমার রক্ত পদচ্ছাপ
তোমার স্বতন্ত্র শতকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও

হে নবীনা, এই মধ্য-ম্যানহাটানে বাতাসের ঝাপটায়
তোমার হঠাৎ খুলে যাওয়া উদ্দাম চুল
আমার বুকের 'পর আছড়ে পড়লো
চিরকালের বাংলার বৈশাখের ঝঞ্ঝার মতন।

তোমার জবার মতো চোখে রাঙা শ্রাবণের জল
পালতোলা নৌকার মতন বাঁকাচোরা ঢেউয়ে ঢেউয়ে কম্পমান
তোমার বিপদগ্রস্ত স্তন।
আমি ভাবতে পারি নি কোনোদিন এতো অসাধারণ আগুন
প্রলয় এবং ধ্বংস রয়েছে তোমার চুম্বনগুলিতে!

হে নবীনা,
আমার তামাটে তিক্ত ওষ্ঠের ও অবয়বের জন্যে
যেসব চুম্বন জমে উঠবে সংগোপনে,
তাদের ওপর থেকে আমার স্বত্বাধিকার আমি ফিরিয়ে নিলাম
আমাকে শীতের হাওয়ার হাতে ছেড়ে দাও,
স্বনির্বাচিত এই নির্বাসনে
নেকড়ের দঙ্গলের মতো আমাকে ছিঁড়ে খাক বরফে জ্বলতে থাকা ঋতু
শুধু তুমি,
আমার সংরক্ত চুম্বনের অন্তর্লীন আগুনগুলোকে
পৌঁছে দাও শ্রাবণে আষাঢ়ে রোরুদ্যমান
বিব্রত বাংলায়,
বজ্রে, বজ্রে, বেজে উঠুক নতজানু স্বদেশ আমার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একে বলতে পারো একুশের কবিতা

এই কবিতাটি সরাসরি একুশের কবিতা নয়,
কিন্তু যদি তুমি অপলক তাকিয়ে থাকো এই শব্দমালার দিকে,
তুমি দেখতে পাবে এই কবিতার ভেতর ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে
শ্রাবনের রাঙা জল–একে তুমি একুশের কবিতা বলতে পারো।

এই কবিতাটি সরাসরি একুশের কবিতা নয়,
কিন্তু যারা প্রেমিক তাদের চোখে ঠিক ধরা পড়বে–
এই কবিতার উপর আষাঢ়ের ঘনমেঘের এবং শাড়ি পরা বাংলার মায়েদের
দীর্ঘ ছায়া পড়ে আছে;
এই কবিতার গভীরে এখনো 'জল পড়ে পাতা নড়ে',
এখনো বিরতিহীনভাবে বয়ে চলেছে বাংলার বর্ষণমুখর রাত্রির কালো হাওয়া
এ কবিতা একুশেরই কবিতা।

এই কবিতাটি সরাসরি একুশের কবিতা নয়।
কিন্তু বৈশাখের খররৌদ্রে সোনালি খড়বাহী গরুর গাড়ির মতো
মন্থরভাবে এগিয়ে চলেছে এই কবিতা, এখন আমি জানি
একুশই হচ্ছে এই পঙ্‌ক্তিগুলোর জরায়ু–
একে আমি একুশের কবিতাই বলতে চাই!

আমার মনে আছে ১৯৫২-এর স্লোগান চঞ্চল একুশের অপরাহ্নে
আমি দেখেছি পাখির পালকের মতো হালকা এক
ভিখিরি বালকের মৃত্যু এক অমোঘ থ্রি-নট-থ্রির গুলিতে।
তার কথা একুশের ইতিহাসে লেখাজোখা নেই;
এই কবিতাটিকে আমি সেই নিহত বালকের
শ্বেত কফিন ও স্মৃতির মিনার বলতে চাই,
এবং সেই অর্থেও একে আমি একুশের কবিতাই বলবো।
সেই এক সময় ছিল যখন বাংলা ভাষা থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল
বাংলা ভাষাকেই। সরকারি উর্দিপরা বিদেশি সৈনিকের মতো ভারী বুট পরে
সদর্পে কুচকাওয়াজ করে বেড়িয়েছে আমাদের অচেনা শব্দগুলো
অথচ আমার এ শব্দমালা বাংলা ছাড়া অন্য কিছু নয়,
আর সেই অর্থেও একে আমি একুশের কবিতা বলতে চাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই কবিতাটি সরাসরি একুশের কবিতা নয়।
কিন্তু যদি বরকত, রফিক, সালাম, জব্বারের অফুরান রক্তের লালে
আমার স্বদেশ ডুবে না যেতো–এই কবিতাটি লেখা হতো না কোনোদিন
অতএব এই কবিতাটিকে আমি একুশের কবিতাই বলতে চাই
দোহাই তোমাদের, তোমরা আপত্তি কোরো না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই এই দীর্ঘ পরবাস

দু টুকরো রুটি কিংবা লাল শানকি ভরা
এবং নক্ষত্রকুচির মতন কিছু লবণের কণা
দিগন্তের শান্ত দাওয়ায় আমাকে চাও নি তুমি দিতে–
তাই এই দীর্ঘ পরবাস।

জীবনকে শ্বাপদসংকুল করে তুলেছো
এবং আমার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর
তোমাদের তাক-করা বন্দুকের নল।
ঝোপে ঝাড়ে সরীসৃপের মতন বুকে
নিরাপদ নির্ভৃত কুটির খুঁজতে হয়েছে আমাকে–
তাই এই দীর্ঘ পরবাস।

যা কিছু বলার ছিল দেশের-দশের কাছে
বলতে পারি নি আমি–
তাই এই পরবাস।

সূর্যে-সূর্যে গাঁথা লাল মোরগের চোখের মতন
হিরন্ময় ভোরবেলাকার শুচিশুভ্রতায়
আমার বিব্রত গানগুলো
কোনো সুষমা পায় নি খুঁজে আজো–
তাই এই পরবাস।

যারা ধরে আছে ধর্মের ধ্বজা
তাদের শিকারি কুকুরগুলোর মুখে
ভোরের নদীর মতো সাদা আমাদের প্রিয় খরগোশগুলো।
আহত-নিহত আজ এবং তারাই
প্রতিশ্রুত আজ বল্গাহীন বাণিজ্যে
তাই বিক্রি হয়ে গেছে আমাদের সমূহসম্ভ্রম, স্বাধীনতা, নিজস্ব আকাশ–
তাই এই দীর্ঘ পরবাস।

একরোখা এক জন্মান্ধ প্রতিক্রিয়া আজ
সওয়ার হয়ে প্রগতির পিঠের ওপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দারুণ মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে–
আর্তনাদ আর রক্তপাতের-ভরা অন্ধকার-প্রিয়
মধ্যযুগের দিকে তাই এই পরবাস।

স্বীকার করছি আমি বৈশাখের রঙ্গালয়ে
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে দেখেছি নৃত্যপর হলুদ-শালিক
বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালা থেকে
দেখেছি হিরণপয়েন্টে দশ হাজার হরিণের জ্যোৎস্না জ্বলা চোখ
দেখেছি সৈকতলগ্ন সমুদ্রের জলে ভেসে থাকা তারা মাছের স্পন্দন
নবদম্পতির চুম্বনের মতো শুনেছি বৃষ্টির ধ্বনি
বাংলার খরায়।

সেই এক সময় ছিল
বাংলার পথে পথে, রৌদ্রজলে সাঁঝে উষায়
অবিশ্বাস্য মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের
অপার তৃপ্তি ছিল হৃদয়ে আমার
আর ছিল অফুরন্ত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আমাদের জীবনকে ঘিরে।
তবুও দেখেছি আমি অকাল জরায় নুয়ে পড়া
সম্ভ্রান্ত কৃষকের হাত
প্রসারিত সভ্যতার শূন্যতার দিকে।
বাংলার বিষণ্ন মানচিত্র
দেখেছি বন্ধুর মুখে,
স্বাধীনতার সৈনিক ছিল যারা
আমি দেখেছি তাদের নিঃশব্দে নিহত হতে
তাই এই দীর্ঘ পরবাস;
চিরকাল পরবাসী আমি স্বদেশে-বিদেশে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সব নদী ঘরে ফেরে

বৃষ্টিশেষের সন্ধ্যাবেলায় এই যে আমি একা একাই
গাছতলাতে দাঁড়িয়ে আছি।
তোমার মতন আমি কি ভাই বলতে পারি–
'যাচ্ছি বাড়ি'।
হেথায় নয়, হোথায় নয়
সাপের মতন একটা রাস্তা চলে গেছে আড়াআড়ি।
লণ্ঠনহীন এ রাত্তিরে কে যায় কোথায়
পুরুষ এবং নারীকণ্ঠ বলল হেঁকে 'যাচ্ছি বাড়ি'

সরু চালের সাদা ভাত আর পাবদা মাছের তরকারি
সাজিয়ে যাঁরা বসে আছেন
তাঁদের জানা দরকারি
ঘর ছেড়ে যে বেরিয়ে গেছে তার থাকে না
ঘরবাড়ি।

তোমার আমার প্রিয় কবি কোথায় যে বলেছিলেন–
সব পাখিরা ঘরে ফেরে,
সব নদী।
আমরা কেন দণ্ডায়মান
গাছতলাতে নিরবধি।
কীর্তিনাশার কালোস্রোতে
নৌকা ভাসে সারি সারি
একবার আমি বলতে পারি–
যাচ্ছি বাড়ি।
যাচ্ছি বাড়ি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবাসের পঙ্‌ক্তিমালা

দ্যাখো, দ্যাখো কী চমৎকার একটা চড়ুই
কী দারুণ কিচিরমিচির করছে আজ মার্কিনি ভাষায় এই
মেঘভারানত
অন্তহীন দুপুরবেলায়! হে চড়ুই
আদলে-গঠনে অবিকল তুমি দেখতে বাঙালি চড়ুইদের মতন
তোমার মুখে কি মানায় বন্ধু শ্বেতাঙ্গের এই বিবর্ণ, বিদেশী
ভাষা,
বরং এদিকে এসো, তোমাকে শেখাই
অ-আ-ক-খ
হে চড়ুই বলো, বাংলা বলো।
বাংলা, যার সব সোনা
গচ্ছিত রেখেছি আমি
নদীর জলের শব্দে, ছলছল বয়ে যাওয়া স্রোতে
ইলিশ ও রোহিতের চোখে, গীতবিতানের শ্লোকে-শ্লোকে
আর বাতাসের তরঙ্গ-তোলা চিরচেনা মহিলার কালো চুলে,
চোখে ও চিবুকে।

হে কাক, হে কালো কাক! হঠাৎ কোত্থেকে তুমি এলে
এই বর্ণবাদী দেশে ? তুমি জানো, এ রাজ্যে অশ্বেতাঙ্গের মূল্য
নেই কোনো;
এখানে কী ? এ বিদেশে কেন ?
যাও, যদি পারো, দাও উড়াল বাংলার দিকে
সেখানে মানাবে বেশ সিল্ক-মসৃণ-তোমার কালো ডানা।

আফ্রিকাতে গেলেও আপত্তি নেই মোটে,
সে তো এশিয়ার সহোদর–আমাদেরই ভাই
কিন্তু এ কী শুরু করলে তুমি আমার কার্নিশে!
এ কেমন বেকায়দা বেঢপ ধরন ? কেন এই চা-চা-চা,
টুইস্ট, হুলাহুপ নাচ।
কত্থক অথবা কথাকলি জানা নেই ?
তা হলে মার্কিন নাগরিক তুমি ? হে কাক। তুমিও ?
অথচ দেখতে শুনতে তুমি হুবহু বাঙালি
কৈ এবং মাগুর মাছের মতো কালো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হে মেঘ! হে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তুমিও ঠকাবে নাকি
হে নিরুদ্দেশগামী ?
কাউকে বিশ্বাস নেই আর এই বিরূপ বিদেশে।
তবু বলি : যদি পারো,
হে নন্দিত মেঘ তুমি নেমে এসো
ঘন ও নিবিড় হয়ে, করুণা ধারায় নেমে এসো
শ্রাবণে শ্রাবণে তুমি, হে বন্ধু স্পন্দিত করে দাও
এই অফুরান পরবাস।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাত্রা

জলের দিকে জল ভেসে যায়
হাওয়ার দিকে হাওয়া।
তাকিয়ে থাকি, চোখ চলে না
সমুদ্দুরের পারে,
একা-একা একলা অন্ধকারে
আমার আছে কেবল নৌকা বাওয়া।

যাচ্ছি কোথায়, কেউ জানে না,
পাগলা হাওয়া বাঁধ মানে না,
রাতের কালো জলে আমার
কথা ছিল একটু থামার।

থেমেও ছিলাম, কেউ ডাকে নি
দুয়ার খুলে কেউ রাখে নি।
অশেষ জলে আশাও যে নেই আর
অন্তিম আমি দেখে যাবো ত্রিযামার।

একা-একা একলা অন্ধকারে
ক্ষান্তিবিহীন চলছে নৌকো বাওয়া,
তবুও আজ তিন পুরুষের
বসতবাটির দাওয়া...
মাঝে মাঝে বলছে হেঁকে–
এ তোমার কেমন চলে যাওয়া,
এ তোমার কেমন চলে যাওয়া।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাক

তরঙ্গগুলো ভীষণ বিক্ষুব্ধ মাঝরাতে
যেন সমুদ্রকে শাসাচ্ছে!
কী চায় এই তরঙ্গগুলো কী বলতে চায়
এই স্লোগান চঞ্চল জলরাশি ? সুষম ধন-বণ্টন চায়
অনটন–ভরা নিরন্নের সংসারে ? চায় অবসান
স্বৈরাচারের ? তৃতীয় বিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো রাষ্ট্রসমূহে
উত্থান চায় বিপ্লবীর ? নাকি বিনষ্টি চায় শুধু নষ্ট হয়ে যাওয়া
এই ক্রন্দনহীন গ্রহের ?

নে নিসর্গ প্রেমিক! তাকিয়ে দ্যাখো কেশর ফুলিয়ে
এক রাগী বাতাস নিজের ক্ষুধার্ত দখলে এনেছে সমস্ত প্রকৃতি
যেন সিংহের থাবার নিচে থরথর করে কাঁপছে
তোমার প্রিয় বৃক্ষরাজি! কী বলতে চায় এই বাতাস!
গতকালও দেখেছি এক তরুণ প্রেমিকের মতো
নিজের লম্বা লম্বা আঙুলে
এই বাতাস গিটারের মতন নিসর্গকে বাজিয়ে চলেছে।
যেহেতু আজো 'গেল না ভোলা ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত মাতৃভূমি'
তাই ক্ষিপ্তবাতাস এমন উন্মত্ত গর্জনে মেতেছে ?
কখনো-কখনো মনে হয় অসাম্যের অবসান যদি না ঘটে
কোনো মন্ত্রেই থামবে না এই বৈরী বাতাস!

সেদিন দেখেছি তিনটে শালিক যথার্থ দার্শনিকের মতো
গভীর পরামর্শে বসেছে তোমাদের বাড়ির উঠোনে।
মনে হলো নিরন্ন মানুষের চিৎকার ওই পাখিদের শ্রুতিগোচর হয়েছে।
যেন ওরা টের পেয়ে গেছে কী বিপন্ন আজ
আমাদের গ্রাম ও নগরগুলো! কী অক্লান্তভাবে বয়ে চলেছে
স্বজনের রক্তধারা আমাদের চতুর্দিকে!
আর এখন তাই আমাদের আকাশ জুড়ে উড়ছে অসংখ্য শোকের
পতাকার মতো কাক ? শুধু কাক ! শুধু কাক !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আমার মতন ভ্রাম্যমাণ এক বিহ্বল মানুষ
ঘরের দিকেই
ফিরতে চাইবে
হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে সুস্থ
সহজ এবং স্বাভাবিক।
আমার নিজস্ব ঘরে প্রতিষ্ঠিত হব বলেই
আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছিলাম একদা
আমার আজন্ম-চেনা গৃহচ্ছায়া থেকে–
আমার প্রথম কৈশোরের রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভোরে।

তারপর থেকেই–ব'লতে পারো, শুরু
হয়েছে আমার,
উত্থানে-পতনে ভরা (এক পা এগিয়ে যাওয়া এবং
দু'পা পিছিয়ে আসা) এক অন্তহীন নক্ষত্রবিহীন
যাত্রা।

শুরু হয়েছে আমার প্রত্যাবর্তন নানান
আঙ্গিকে। একদা
পদব্রজে
(বলতে পারো) আমার বাড়ির দোরগোড়া অবধি
পৌঁছে গিয়েছিলাম পা-টিপে
পা-টিপে আমি, আহত জন্তুর মতো নিজস্ব গুহার খোঁজে।
কিন্তু শিকারিদের উল্লাস আর সারি সারি বল্লমের সুতীক্ষ্ণ উল্লাস
বাধ্য করেছে আমাকে ঘরের দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে।
আর সেবার যখন মন্ত্রের মতন গুঞ্জরণে–ভরা
এক বৃষ্টি পড়া রাত্রে
লণ্ঠন নিভানো নৌকোর গলুই
দু'হাতে আঁকড়ে
ভেসে আমি যাচ্ছিলাম সেদিকে
যেখানে জ্বলছে বিষণ্ণ স্বদেশ
শবেবরাতের মোমের আলোর মতন
এয়োতির কপালের সিঁদুরের মতন
এবং তখুনি সীমান্তের টহলদার সৈনিকদের বন্দুক উঠেছে গর্জে বারবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্য একবার, উদ্দাম, ঝোড়ো আবহাওয়ায়
একটি নিমজ্জমান জাহাজের ডকে দাঁড়িয়ে দেখেছি
অপসৃয়মাণ উপকূলে,
তিমিরে আচ্ছন্ন,
একটি অচেনা পাহাড়ের সানুদেশে,
আমার মা'র কপালের টিপের মতন
আমার বোনের নাকফুলের মতন
জ্বলজ্বল করছে একটি গ্রাম।
'ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন জাহাজ থামাও'।
না, আমি পারি নি চিৎকার করতে
অথচ আমার
হৃৎপিণ্ডে এখনো বেজে চলেছে জলের পর ঘর-ফেরা
ছিপ নৌকোর বৈঠার মতন! 'ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন'

তিন তিনটে মহাদেশ থেকে
অন্তত দু'বার উড়োজাহাজের টিকেট কিনেও
তোমাদের উঠোন পেরিয়ে
নিজস্ব আটচালার দিকে যাত্রা সাঙ্গ হয় নি এখনো
তোমরা বিশ্বাস করো
ছয় বেহারার পালকিতে আমিও
চেপেছি একদা এবং 'হুমনা হুমনা'
করতে করতে সেই গাঁয়ের নদীর
কিনার অবধি
পৌঁছে
'পৃথিবীকে মায়াবী নদীর তীরে এক দেশ ব'লে
আমারও হয়েছে মনে'
কিন্তু আমি
সেখানে আমার গাঁ কিংবা শহর
কিংবা বাড়ি কিছুই এখনো খুঁজে পেলাম না।

বলতে পারো আমিও নাছোড়বান্দা
নানা দেশে ও বিদেশে ঘুরে
বিভিন্ন ধরনের ধান্দা জানা আছে আমারও
অতএব বলছি, আবারো বলছি :
আমি ভ্রাম্যমাণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রা ঘরের দিকেই–পদব্রজে,
হামাগুড়ি দিয়ে, গিরগিটি বা সাপের মতো
বুকে হেঁটে হেঁটে
কিমাশ্চর্য!
যতোবার আমি ঘরের নিকটবর্তী হই
কুয়াশা আক্রান্ত সেই বারান্দায় রয়েছে দাঁড়ানো আজো
একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি–একদা কৈশোরে
যে আমাকে জানিয়েছিলো বিদায়, সেই ছায়ামূর্তি
আজো, এখনো, আমাকে লক্ষ্য ক'রে উড়িয়ে চলেছে একটি বিদায়ী
রুমাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও